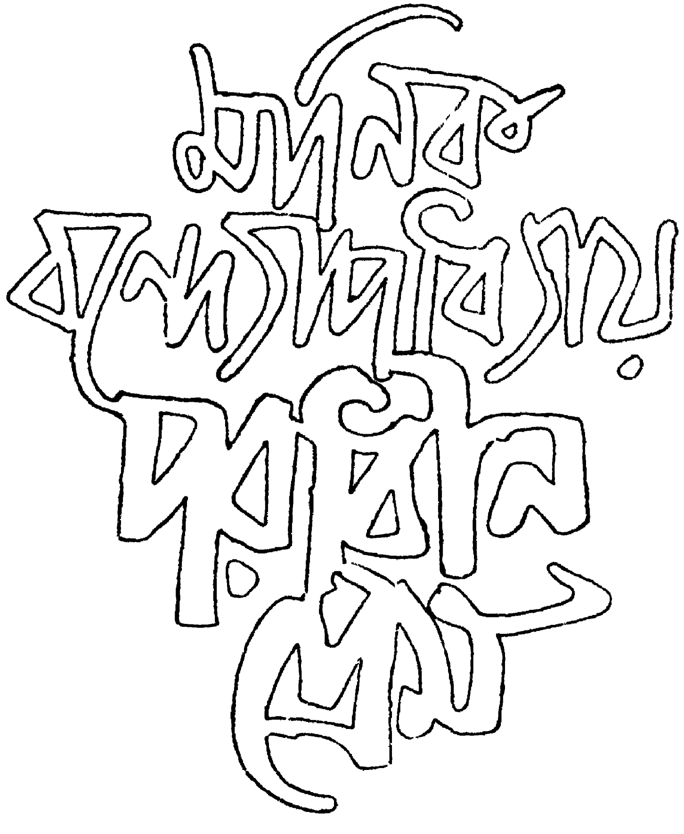

মানিক
বন্দ্যোপাধ্যায়

Paradhin Prem
A Bengali Novel
By : Manik Bandyopadhyay

পরাধীন প্রেম

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২
মে ১৯৫৫

প্রকাশিকা : অনন্যা জানা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

মুদ্রক : ইউনাইটেড প্রিন্টার্স
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
১২৪ বি, রাজা রামমোহন সরণী.
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশিকার কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর রচনা যুগোত্তীর্ণ। **'পরাধীন প্রেম'** উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬২ সালে। দীর্ঘ ৩৬ বছর পর গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশনার সহায়তায় তাঁর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুত্র শ্রদ্ধেয় সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। কবি-গবেষক শ্রদ্ধেয় যুগান্তর চক্রবর্তীকে ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরাধীন প্রেম

পরাধীন প্রেম

পরাধীন প্রেম

পরাধীন প্রেম

পরাধীন প্রেম

এক

সেদিন সকালটা ছিল বেশ ঠাণ্ডা।

শীত যেন গিয়েও যেতে চায় না।

বসন্তকে ঠেকিয়ে রাখবেই জিদের বশে।

দিন দুই পাত্তা নেই শীতের।

দিব্যি দখিনা বইছে।

শেষ রাতে শীত যেন দমকা মেরে ফিরে এল।

তার সঙ্গে টিপিটিপি বৃষ্টি।

বেলা তখন ন'টা হবে। বৃষ্টি চলেছে সমানে। শীত আরও জাঁকিয়ে এসেছে। শুধু সুতির গেঞ্জিটা গায়ে চাপিয়েছে বিনয়। লাল উলের ঘরে বোনা জামাটা গায়ে চাপালে যখন মন্দ হয় না।

বসন্তকে দমন-করা বাতিল-করা অসময়ের শীতকে সম্মান দিতে বিনয়ের মন চায় না।

লাল উলের জামাটা তাই কি সে গায়ে চড়ায় না?

কান্তা কাল কলেজে যায় নি। অনিলের কাছে নোট্‌স টুকে নিতে এসে সে বিনয়ের বাড়ীতে উঁকি দিয়ে যায়। বিনয়ের বেশ দেখে বলে, এ বড়াই ভাল নয়। পরীক্ষা আসছে, মনে নেই বুঝি?

ঃ তুমি বুঝি দেবে না এবার?

ঃ পরীক্ষা না দিয়ে উপায় আছে!

ঃ তোমার গায়ে তো একটা আলোয়ানও দেখছি না।

কান্তা একটু হাসে। মেয়েদের ঠাণ্ডা লাগে না।

ঃ যে মেয়ে দিনরাত পড়ে পড়ে ছেলেদের হারিয়ে ফার্স্ট হয়, তারও কিছু হয় না?

কান্তা মাথা নাড়ে।—না। তার আসল কারণ কি শুনবে? দিনরাত পড়ার সুযোগ নেই—সংসারে খাটতে হয়। এ দেশে মেয়ে পুরুষে অনেক তফাত ভুলে যেও না।

হাসতে গিয়েও সে হাসে না। হাসিটা যেন ঠোঁটে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে থাকে।

তারপর মুখ খোলে কান্তা—

ঃ অনিলের কাছে নোট্‌স টুকতে এসেছিলাম। বাবা, কি থমথম করছে বাড়িটা, সকলের মুখ যেন ভাতের হাঁড়ি! প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিলাম—তারপর খেয়াল হল, বকুলকে নিয়ে ওর বাবা আজ সকালে পৌঁছবেন—ছেলের কঠিন রোগ-ব্যারাম আছে কিনা না জেনেই কেন যে মেয়েদের বিয়ে দেয়! দিনকাল কি পাল্টায় নি?

ঃ ওদের কাছে কতটুকু আর পাল্টেছে বল? সতেরো ওদের বাড়িতে কম বয়স নয়!

বকুলের মা বাবা রাতে ঘুমোত না। ছেলেবেলা থেকে আসি যাই মিলি মিশি, বকুলকে আঁতুড়ে দেখেছি—তবু আমি বাড়ি গেলে পর্যন্ত কড়া নজর রাখত।

ঃ তবু যেতে ?

ঃ কেন যাব না ? ও তো অপমান করা নয়—ওদের কাছে ওটাই সাধারণ রীতি।

কান্তা আর বসে না।

পাস-ফেলে কিছু আসে যায় না বিনয়ের। কিন্তু পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হবার পালা চালিয়ে যেতে না পারলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ন'টা নাগাদ হঠাৎ অনিলদের বাড়িটা কান্নায় যেন ফেটে পড়ে।

বিধবা বকুলকে নিয়ে প্রমোদ বাড়ি ফিরেছে।

হন্তদন্ত হয়ে বিনয়ের মা ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ায়।

ঃ ও ! তাইতো, ভুলেই গিয়েছিলাম বকুল ফিরল। হঠাৎ ভাবলাম ওদের কোন বিপদ আপদ ঘটল নাকি ! বিপদ যা ঘটবার তা আগেই ঘটে গেছে !

মন্দাকিনীর চোখ জলে ভরে যায়।

ঃ না বিনয়, আমি যেতে পারব না, আমায় যেতে বলিস না। কচি বয়েস থেকে ঘরের মেয়ের মত এসেছে গিয়েছে—

ঃ কি দরকার কান্নাকাটির মধ্যে যাবার ? কিছুই তো করতে পারবে না গিয়ে।—কান্না না থামানোই ভাল।

খানিক পরে কান্তা আবার আসে। বলে, অনিলদের বাড়িতে বকুলকে দেখব বলে এলাম, ঢুকতে পারলাম না।

বিনয় বলে, সেকেলে গোঁড়া ফ্যামিলি তো—ওরা একটু সোরগোল করেই কাঁদে। এইটুকু মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল, বিষম দায় ঘাড়ে চাপলো। শুধু খাওয়ানো পরানোর দায় নয়, বুড়ি হওয়া পর্যন্ত সামলে চলার দায়।

ঃ বুড়ি হওয়া পর্যন্ত ? মরা পর্যন্ত নয় ?

ঃ এ জেলখানায় বুড়ি হওয়া পর্যন্ত বাঁচা মানেই, মরে গিয়ে পেতনী হয়ে মরার বাড়া জের টানা।

ঃ অনিলও কি সেকেলে ! ফ্যামিলির প্রভাবটা কি জিনিস আজ ভাল করে জানতে পারলাম। সামনে পরীক্ষা, কোমর বেঁধে পড়ছি—হঠাৎ অনিল গিয়ে হাজির। বললে কি জানো ? বকুলের আসার সময় হয়েছে, তাই পালিয়ে এলাম, আমার জন্য দু'এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করলেও তুমি ফার্স্ট হবে—ভেবো না।

বিনয় বলে, বোনটাকে খুব ভালবাসে।

কান্তা বলে, আমাদের বাড়ি থেকেও কান্না শোনা যাবে ভাবতেও পারেনি। অস্পষ্ট হলেও কান্নার আওয়াজ শুনেই মুখখানা কী রকম যে হয়ে গেল ! ঠিক কচি ছেলের মত কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, না, আরও দূরে পালাই ! অনিলের মত স্মার্ট একেলে ছেলে, বাড়িতে থেকে কোথায় সকলকে সামলাবে—

বিনয় বলে, ব্যাপারটা তুমি বুঝলে না! বাড়ির লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অনিলের যে কি দুর্গতি! নিজের কান্না সামলাতে ও কি আরও দূরে পালিয়েছে? যতই সংস্কার কেটে গিয়ে থাক, বোনের বেশ দেখে নিজেরও একটু কান্না তো পাবেই। আদুরে বোনটার এ দশা হল—বোনটার জন্যে নিজের মতে কিছু যে করবে সে উপায় পর্যন্ত নেই,—বাড়িতে ওর মতের দাম কানাকড়ি। ওর কাছে আর অসহ্য ঠেকবে না বাড়ির লোকের এ রকম হৈ-হুল্লোড় কাঁদাকাটা, তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যা শোনা যায়?

অনেকক্ষণ কান্তা চুপ করে থাকে। বকুলদের বাড়ির ঝিমিয়ে আসা কান্নার আওয়াজটাই বোধহয় শোনে।

তার চোখ সজল হয়ে এসেছে দেখে বিনয় এতটুকু আশ্চর্য হয় না।

ঃ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবে না?

ঃ এভাবে কোন মানুষকে আগে বেঁধে শর্ত করে কথা বলো না। রাগ হলে নিশ্চয় রাগ করব!

বিনয় হাসতে গিয়ে সামলে নেয়। কানের কাছেই বকুলদের বাড়ির কান্নার আওয়াজ বাজছে।

সোজাসুজি সে জিজ্ঞাসা করে, অনিলকে সত্যি সত্যি হারিয়ে তুমি বরাবর ফার্স্ট হচ্ছো? না, তোমার জন্য অনিলের কোন কারসাজি আছে এর মধ্যে?

লাল হয়ে যায় কান্তার মুখ।

ঃ অনিলকেই জিজ্ঞাসা করো।

বকুলদের বাড়ি যেতে মন চায় না বিনয়ের। অনিলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়। তার ভাব অবশ্য শান্ত, কেবল মুখখানা একটু বিষণ্ণ ও গম্ভীর। কিন্তু বাড়ির অন্য সকলে?

কে জানে গিয়ে কি অবস্থায় দেখবে সকলকে আর বকুলকে!

বকুলের মা হয়তো খাটে শুয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করছে। বকুলের বাবা হয়তো একটা চেয়ারে বসে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে। আর বকুল মূর্তিমতী বিষাদের মত অশ্রুশূন্য অপলক নয়নে নিজের অদৃষ্টের এই সুতীব্র পরিহাসের কথাটাই ভাবছে।

কি হবে গিয়ে? যাক ক'দিন।

বকুল আসবার তিন দিন পরে তাকে বিনয় দেখল।

সকালবেলা বই খুলে বকুলের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে কান্তার কথা মনে জেগেছিল সে টেরও পায়নি। যে আঘাত বকুলের জীবন শূন্য নিরর্থক করে দিয়েছে সেও তো সেই আঘাতই পেয়েছে। সুদীর্ঘ জীবনে ক্ষণিকের মিলনের আশা-স্পর্শলেশ-হীন প্রিয় বিরহের যে বেদনা সে তো তারও ভাগ্যলিপি!

কান্তা বা অনিল তাকে কিছুই বলে নি কিন্তু স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত দীর্ঘদিন দু'জনের মধ্যে প্রীতির খেলার প্রতিযোগিতা যে ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করে এসেছে, অনিল অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারলেও সে বরাবর ইচ্ছা করে নিজে একটু পিছিয়ে

থেকে কান্তাকে ফার্স্ট হতে দিয়েছে এবং কান্তাও যেভাবে প্রেমিকের উপহারের মতই অনায়াসে খুশি মনে সেটা গ্রহণ করেছে তা থেকে কান্তার জীবনের এমন গুরুতর দিকটা কি অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় !

বিশেষ বন্ধু তার পক্ষে তো কষ্টকর নয়ই, আরও অনেকেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছে। অনিলদের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়ে আছে—কবে অনিল একটা বে-জাতের বে-ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে বসে !

অনিল হয়তো একটা চাকরি হবার অপেক্ষায় আছে। তারপর কি হবে কে জানে !

কিন্তু বিনয় জানে, ওরকম কোন পরিকল্পনা অনিলের মগজে নেই। সে এগোয় না, কান্তাও শুধু মেলামেশা বজায় রেখে চলে, তাকে টানবার কোন চেষ্টাই করে না।

কান্তা একটু সক্রিয় হলে অনিলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বে সন্দেহ নেই। বাড়ির লোকের চিন্তা বা নিজের সংস্কার কিছুই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

কিন্তু বিনয় জানে কোন অসাধারণ কারণে চেতনায় একটা ওলট-পালট ঘটে না গেলে কান্তা কোনদিনই তা পারবে না। প্রেমকে সার্থক করতে, প্রেমিকের জড়তা ভেঙ্গে দিয়ে তাকে কাছে টানতে যেটুকু উস্কানি দেওয়া কোন মেয়ের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জা বা অপমানের ব্যাপার নয়, অশোভন আচরণও নয়—সেটুকুও কান্তার মধ্যে কুলোবে না।

কান্তা বোধহয় জানেও না যে অনিলের ভুল আর বোকামিকে নির্বিচারে মেনে নেওয়া তারও কত বড় ভুল এবং বোকামি !

মাঝে মাঝে বিনয়ের রাগ হয়। ইচ্ছা হয়, দু'জনকে সব বুঝিয়ে বলে। কিন্তু এটাও সে জানে যে তার উপদেশে ফল হবে না। ওই প্রসঙ্গ তোলারও তার উপায় নেই।

ভালবাসার কথাই দু'জনে অস্বীকার করবে !

বকুল এসে প্রণাম করে দাঁড়ায়।

তার দিকে চেয়েই বিনয় চমকে ওঠে !

তার বিধবা বেশ দেখে নয়, তাকে দেখে। বাইরের বেশে নয়, তার নিজের দেহে এতখানি পরিবর্তন, এতখানি বিস্ময়কর নূতনত্ব নিয়ে সে এসেছে যে বিস্ময়ে বিনয় অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মুখের দিকে, বকুলের দেহের দিকে চেয়েই মনে হল, এ তো সে বকুল নয় ! সেই চঞ্চলা পাহাড়ী ঝরণার মত লীলায়িতা বকুল যেন এই স্থিরা, ভাদ্রের কূলে কূলে ভরা নদীর মত অচঞ্চলা বকুলের মাঝে কোথায় আত্মগোপন করেছে ! সে ছিল শিল্পীর অসমাপ্ত চিত্রের মত অসম্পূর্ণ, কিন্তু এই দু'বছরে শিল্পী যেন কখন তার চিত্রটি সমাপ্ত করে গেছে। কোথাও রেখার অসম্পূর্ণতা নেই, রঙের বেমানান ছোপ নেই। মৃগশিশুর মত তার চঞ্চল উৎসুক দৃষ্টি পর্যন্ত গভীর হয়ে এসেছে। গালের পুষ্টতার ঔজ্জ্বল্য সমস্ত মুখে সৌন্দর্যের জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়েছে। দেহের আগাগোড়া যেন কোন নিপুণ ভাস্কর পরম যত্নে নূতন করে গড়ে দিয়েছে।

তার বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে বকুল বলে, কি দেখছ বিনয়দা ? আমার নতুন রূপ ? মানিয়েছে ?

তার ভেতরটাও বদলে গেছে, সন্দেহ নেই। এ তো সেই বকুলের কথা বলবার ধরণ নয়!

বিনয় অবাক হয়েই থাকে।

ঃ বল না বিনয়দা, মানিয়েছে?

এবার বিনয় মুখ খোলে।

ঃ কি বলছ বকুল? এ বেশে তোমায় মানায়!

ঃ দু'বছর আগে আমায় কি বলে ডাকতে, তাও ভুলে গেছ নাকি বিনয়দা? তুই থেকে একেবারে তুমি!

বকুলের এমন সহজ কথাবার্তা শুনে বিনয় আরও বেশি আশ্চর্য হয়ে যায়। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় এত বড় একটা দুর্ভাগ্য তার মনে যেন এতটুকু ছায়াপাত করতে পারে নি। দিব্যি শান্ত নির্বিকার ভাব, যেন কিছুই ঘটেনি।

বকুল বোধহয় তার মনের ভাব বুঝতে পারে, বলে-কি ভাবছ বলব? ভাবছ মেয়েটা তো বেশ! বিধবা হয়েও এতটুকু দুঃখ নেই। কি করব বলো, প্রথম ক'দিন কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছি। শেষে ভেবে দেখলাম, তাতে লাভ? মা'র কান্না আরও বেড়ে যায়, বাবা ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কেঁদে তো লাভ নেই, কিন্তু আমি কি করে বেঁচে থাকব বিনয়দা?

শেষটুকু বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার কোলে মুখ গুঁজে বকুল হু হু করে কাঁদতে আরম্ভ করে। ঠিক তেমনি ভাবে কাঁদে, অল্প বয়সে এক একদিন বাড়িতে বকুনি খেয়ে এসে যেভাবে কাঁদত।

ঠিক! এই তো স্বাভাবিক! একটা অস্বাভাবিক বিকৃত নির্বিকারত্বের বোঝা মানুষ কতক্ষণ বইতে পারে! তাকে কাঁদতে দেখে বিনয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মুখের কথায় সান্ত্বনা দিয়ে তাকে অশান্ত করবার চেষ্টা না করে নীরবে একটা হাত তার মাথায় রাখে। দু-ফোঁটা জল তারও চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে।

মা ঘরে আসে। তাদের দিকে চেয়ে কতকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিয়ে দ্রুতপদে চলে যায়।

একটু পরে বকুল উঠে দাঁড়ায়, একটিও কথা না বলে বিদায় না নিয়েই সে চলে যায়।

বকুল চলে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে বেদনা ও সহানুভূতির প্রচণ্ড উত্তেজনা শান্ত হয়ে আসে। একটা অপূর্ব পুলকের অনুভূতি যেন দু'হাত দিয়ে কান্নার ছোঁয়াচ লেগে জেগে-ওঠা কান্নাকে বিনয়ের মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে থাকে। বকুল যতক্ষণ তার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল, ততক্ষণ তার পরম স্নেহের পাত্রীর বুক-ফাটা দুঃখের স্পর্শে তার মধ্যেও যে বেদনাবোধের, দুঃখবোধের আলোড়ন জেগে উঠেছিল তার মাঝে সেই স্পর্শের পুলকটুকু তলিয়ে গিয়েছিল। বকুল যখন চলে গেল তখন সেই পুলকের অনুভূতি তার মনের আনাচে-কানাচে উঁকি মারতে লাগল।

বকুল নিজে এসে প্রণাম করে অনুযোগ দিয়ে গিয়েছে।

না গেলে মনে ব্যথা পাবে।

ইচ্ছা হলে সময় মোটে এক মিনিট লাগে বকুলদের বাড়ি যেতে। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই বিনয়ের মনে প্রশ্ন জাগে—বকুল ব্যথা পাবে বলেই কি শুধু? আর কি কোন কারণ ছিল না! বকুলের কপাল পোড়ার ব্যাপারটা অল্পে অল্পে আড়ালে ঠেলে পিছিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার কারণ! চেষ্টা করলে সে কি আর বকুলকে সাধারণ গল্প করার স্তরে তুলতে পারত না?

সকলে এখন ব্যস্ত।

অনিল যাবে চাকরির জন্য ইণ্টারভিউতে হাজির হতে, তার কাকা যাবে অফিসে চাকরি করতে।

বকুলকে শুধু টুকিটাকি কাজ করতে দেওয়া হয়—সেও তার খুশি হলে।

সোমত্ত বিধবা মেয়ে বলে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দায় ও ঝঞ্ঝাট এড়িয়েছে—কিন্তু খরচ পাঠায় মাসে ত্রিশ টাকা।

বকুল বলে, সাধে কি পাঠায়? ব্যবস্থা করে গেছে, তাই পাঠায়। আরও বেশি পাঠানো উচিত ছিল - যাকগে!

আড়ালে নয়, কর্মব্যস্ত সকলের চোখের সামনে বিনয় বারান্দায় সেকেলে লড়বড়ে মোড়াটায় বসে, তাকে চা করে এনে দিয়ে বকুল বসে কাছেই বারান্দার সিঁড়িতে, শীত-শেষের একফালি কাঁচা রোদে পা ঝুলিয়ে।

পাঁচী এসে সিঁড়ির নিচের ধাপে সেই রোদের ফালিতে পিঠ দিয়ে উবু হয়ে বসে সকলকে শুনিয়ে চড়া আপসোসের সুরে বলে, তুমিও কপাল পুড়িয়ে এলে দিদিমণি? তোমার দিকে চেয়ে মোর যে কান্না পাচ্ছে গো! একটুখানি ছোট বাড়ি। ঘর রান্নাঘর বারান্দা একফালি উঠান --সবই গায়ে গায়ে লাগাও, ঘেঁষাঘেঁষি।

অনিলের পাতে পাতলা মসুর ডাল হাতায় করে ঢেলে দিতে দিতে বকুলের মা যেন মুখ না তুলেই বলে, ওসব কথা থাক্‌না পাঁচী! কান্না পেলে ঘরে গিয়ে কাঁদিস।

—পাঁচী বলে, এই কচি মেয়্যাকে এবেশে দেখে বুকটা যে মোর ফেটে যাচ্ছে গো!

পাঁচীর বয়স খুব বেশি নয় বকুলের চেয়ে—মুখখানা যতই পাকা দেখাক। তাবও বিধবার বেশ। যদিও বকুলের মত স্পষ্ট নয়। সিঁথিতে বা কপালে সিঁদুর নেই, হাতে লোহা শাঁখা নেই, পরনে তার পুরুষের ধুতি। সাবান-কাচা ম্যাটমেটে ধুতিটা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, অপ্রধান হয়ে গেছে তার বৈধ বৈধব্য--ফর্সা ধবধবে সাদা সেমিজ থান ধুতিতে নিরাভরণা বকুলের ধবধবে বৈধব্যের তুলনায়।

ঝাঁঝালো গলায় বকুলের মা বলে, তুই কেন আসিস পাঁচী? তোকে না ঘরে ঢুকতে বারণ করেছি?

পাঁচী বলে, দুয়ারে আগল দিয়ে রেখো-- ঢুকতে না পারলে এসবো না!

বিনয় মিষ্টি সুরে বলে, এসেছিস এসেছিস, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওসব কথা না বললে হয় না?

পাঁচী এবার যেন একটু ভীতভাবে বলে, পেরানে কথা উঠবে, মুয়ে বলবো নি ? মন্দ কথা কি বললাম ?

শাকপাতা, কুমড়োর ঘণ্ট দিয়ে মাখা ভাত ক'টা সাবধানে চিবোতে চিবোতে অনিল শেষ করেছিল খাওয়ার পর্ব। সে ডেকে বলে, পাঁচী শোন ?

ঃ কি বলছেন দাদাবাবু ?

ঃ তোর মা কেমন আছে রে ?

ঃ কাল পরশু শ্মশানঘাটে রওনা দেবে !

ঃ চিকিৎসায় কিছু হল না ?

ঃ চিকিচ্ছে হল কই ? তোমাদের কার্তিক বলে, ঠিক মত চিকিচ্ছে হলে এ বেরাম সারতে কতক্ষণ।

আঁচলে চোখ মুছে, নাক ঝেড়ে পাঁচী বলে, যাচ্ছে যাক। যাওয়াই ভাল। এত যন্ত্রনা সয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল।

পাঁচী হয়তো বাইরের দরজা পার হয় নি, বিধবা ছোট পিসি গঙ্গা রাগে ফেটে পড়ে বলে, ওই নচ্ছার বজ্জাত মাগীটার সঙ্গে তুই এত মিষ্টি সুরে কথা বলিস কেনরে অনিল ?

সংসারে মাথা নত করে নম্র হয়ে থাকে গঙ্গা। মুখে তার প্রায় রা থাকে না বলা যায়।

বাড়ির সকলে তাকে সমর্থন করবে শুধু এ রকম বাছা বাছা বিশেষ ব্যাপারে মাঝে মাঝে সে ফোঁস করে ওঠে।

ঃ কেন ? কি করেছে পাঁচী ?

ঃ কার্তিকের সাথে কি কেলেঙ্কারি করছে মেয়েটা জানিস নে তুই ?

ঃ জানি। কেলেঙ্কারি কিছুই করছে না। পাঁচীর মা মরমর—নইলে বিয়ে ওদের হয়ে যেত।

বকুল এমনভাবে শিউরে ওঠে যে তা লক্ষ্য করে বিনয় আশ্চর্য হয়ে যায়।

ক্রমে ক্রমে বিনয় বুঝতে পারে তেমন আঘাত লাগে নি বকুলের, গভীর শোক তার জাগে নি।

বাড়ির পাঁচজনে কাঁদে, সে-ও কাঁদা উচিত মনে করে কাঁদে।

দশজনে তার যে দুর্ভাগ্যের কথা বলে সেজন্য যতটা কাঁদে, সতীশের জন্য হয়তো ততটা নয় !

বিনয়ের মনে পড়ে যায়, সতীশের বয়স খুব বেশি না হলেও বকুল তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ।

বৌ মরার দু'মাসের মধ্যে সে আবার বকুলকে বিয়ে করেছিল।

বছর দেড়েকের ঘরকন্নায় এরকম একটা মানুষ এমন কি মায়া-মমতা সৃষ্টি করবে ছেলেমানুষ বকুলের মনে, এমনভাবে কি করে তার প্রাণটা বাঁধবে যে সে মারা গেলে

শোকে আকুল হয়ে উঠবে বকুল ! বকুলের শ্বশুরবাড়ির জীবন, স্বামী-সম্পর্কের জীবন মোটামুটি কল্পনা করা কঠিন নয় বিনয়ের পক্ষে।

সতীশ শ্বশুরবাড়ি আসত খুব কম, দু'একদিনের বেশি থাকত না। টের পাওয়া যেত দুরারোগ্য ব্যাধিটার জন্যই তার এই সঙ্কোচ। বিনয় গিয়ে একরকম জোর করেই তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করত।

বকুলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলা একেবারেই পছন্দ করত না সতীশ। বিনয় এটা প্রথমে বুঝতে পারে নি।

সতীশ এলে ওদের বাড়ি গেলে বকুল প্রায় সামনেই আসত না, সামনে পড়লেও দু'-একটা কথা বলেই আড়ালে পালিয়ে যেত।

এটা তার সতীশকে লজ্জা করা ভেবে, মনে মনে আমোদ বোধ করত বিনয়।

আমোদ বোধ করত বলেই মজা করার জন্য একদিন সতীশের সামনে তাকে ডেকে সে'তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল।

বকুল তার দিকে মুখ তুলে তাকায় নি। সঙ্কুচিতভাবে সংক্ষেপে তার কথার দু'-একটা জবাব দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আড়ালে।

পরদিন এক ফাঁকে—খুব সম্ভব সতীশের একা সিনেমা দেখতে, আমোদ করতে বার হবার ফাঁকে—তাদের বাড়ি এসে কাতরভাবে আবেদন জানিয়েছিল, বিনয় যেন তার সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা না করে।

ঃ কেন রে ?

ঃ বিয়ে হয়নি আমার ? তোমার সেই আগেকার কচি বোনটি আছি নাকি !

ঃ উনি পছন্দ করেন না।

ঃ নিজে বলেছে পছন্দ করে না ?

ঃ বলেছে বৈকি। সত্যি কথাই তো। ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা আছে বলেই বিয়ের পরেও একজন জোয়ান ছেলের সঙ্গে মেলামেশা চলে ?

ঃ মেলামেশা তো নয়, দশজনের চোখের সামনে দু'টো কথাবার্তা বলা।

ঃ উনি তাও পছন্দ করেন না।

ঃ সতীশ তো তাহলে বড় ছোটলোক ! এরকম ভাবে তোকে—

কানে আঙ্গুল দিয়ে বকুল বলেছিল, ছি বিনয়দা ! আমায় একথা বলতে আছে ? শুনলে পাপ হবে না আমার ?

স্বামীর নিন্দা শুনলে পাপ হয় ছেলেমানুষ বকুলের এ' জ্ঞান ছেলেবেলা থেকেই টনটনে !

অজানা নয় অচেনা নয়, তবু কোন মেয়ে কেবল কিছুদিন চোখের আড়াল থেকে ঘুরে এসে এমন চমক দিতে পারে, এমনভাবে ওলট-পালট করে দিতে পারে মানুষের হৃদয় মন !

যা নিছক স্নেহ, তা এত তাড়াতাড়ি রূপ নিতে পারে প্রেমের !

তার নিজেরই ব্যাপার। তবু যেন বিশ্বাস হতে চায় না!

এই বকুলকে স্নেহ করত, ছোট বোনের মত স্নেহ করত, দু'বছর আগে যে বকুলের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিল। প্রস্তাবটি শুনে মনে মনে একটু কৌতুকের হাসি হেসে মা'র মুখের ওপর বলেছিল, ছোট বোনকে বিয়ে করব, বলছ কি মা?

বলে এক মিনিটে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দিয়ে সাজগোজ করে বীণার মন ভুলাতে গিয়েছিল। কিন্তু এই সপ্তদশী দৃপ্ত-যৌবনা বকুল তো সে বকুল নয়! সে বকুল নেই, সে অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেছে। এ-বকুলের সঙ্গে-সে বকুলের কোন সম্পর্ক নেই। এ বকুল কোন দিন ছিল না, এখন আছে। সেই বকুলকে সে চায়নি, এখনো চায় না। কিন্তু এই বকুলকে চায়। তার সমগ্র প্রাণ দিয়ে সমস্ত মন দিয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে চায়।

কিন্তু এ চাওয়ার পরিণাম কি?

কিভাবে সার্থক হবে তার প্রেম?

আজ বিনয় টের পায় বকুলকে বিয়ে করার কথা একদিন সে যে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, তার বড় একটা কারণ ছিল বকুলের সেকেলে রক্ষণশীল পরিবারে মানুষ হওয়া, ছেলেবেলা থেকে তার ব্রত-পূজার ঝোঁক এবং সংস্কার-বোঝাই মন।

বকুলকে সে আপন করতে পারে—যেদিন খুশি পারে। খালি বাড়ি জানলেও বকুল বিনা দ্বিধায় সে ডাকলেই আসবে—যে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলে বিনা দ্বিধায় তার সঙ্গে যাবে।

কিন্তু তারপর?

বিনয় শিউরে ওঠে!

তাকে যেভাবে বকুল এত বিশ্বাস করে এসেছে এক ধাক্কায় সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিতে পারে বটে, কিন্তু সে আঘাত বকুলেরও লাগবে। বিশ্বাসের সঙ্গে সে-ও হয়তো চুরমার হয়ে যাবে।

সামাজিকভাবেও সে যদি আজ বকুলকে পেতে চায়, যদি বিয়ের প্রস্তাব তোলে—এখনকার মন নিয়ে বকুল শিউরে উঠে কুঁকড়ে যাবে!

বকুলকে বদলে নেওয়া ছাড়া, তার অনেক ধারণা অনেক বিশ্বাস অনেক সংস্কার গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেলা ছাড়া, তার প্রাণেও প্রেম সঞ্চার করা ছাড়া তার হঠাৎ জাগা প্রেমের সার্থকতার উপায় নেই।

বকুলকে তার চাই-ই, তার জন্য যে দুর্দম কামনা তার মধ্যে জেগেছে তাকে থামিয়ে রাখবার সাধ্য তার নেই। কিন্তু তাড়াতাড়ির কাজ নয়, অধীর হলে চলবে না। একটি একটি করে ইট সরিয়ে প্রাচীর ভাঙতে হবে। অতি সন্তর্পণে বিপুল ধৈর্যের সঙ্গে তার মনের মুখ ফিরিয়ে দিতে হবে। তিল তিল করে তার বিশ্বাসের গোড়া এমনভাবে খুঁড়তে হবে যে যখন সে-বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়বে, তখন সে ব্যথা পাবে না, বরং খুশিই হবে। এমনভাবে তাকে নিজের দিকে টেনে আনতে হবে যে সে বুঝতেও পারবে না সে তাকে টেনে এনেছে, সে নিজে আসে নি। তবেই তাকে পাওয়া সার্থক হবে।

বিরাট ধৈর্য, বিপুল অধ্যবসায়, অপূর্ব সংযম, অতি সন্তর্পণে চারিদিক বিবেচনা করে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ করা—এর একটার অভাব হলে তার চেষ্টা যে বিফল হবে এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি বিনয়ের ছিল।

ছ'-ছ'টা মাস একেবারে চুপচাপ নিশ্চেষ্টভাবে কাটিয়ে দেয়। নিজের জীবনে যে বিপর্যয়কর কান্ডটা ঘটে গেছে তার দাপটটা সামলে শান্ত হবার জন্য তাকে সময় দেওয়া চাই-তো!

তারপর তার অপূর্ব জয়যাত্রা শুরু হয়—তিল তিল করে সীমারেখা বাড়িয়ে বকুলের সমগ্র হৃদয় মন দখল করার অভিযান।

বিনয় জানে, তার সঙ্গে যখন বিয়ের কথা উঠেছিল তখন তার কিশোরী চিত্তে তাকে নিয়ে ভারী একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে সে তাকে ভক্তি করেছে, শ্রদ্ধা করেছে এবং খুব সম্ভব যে ক'টা দিন তার সঙ্গে বিয়ের কথাটা নিয়ে সকলে আলোচনা করেছিল, সে ক'টা দিন তাকে ভাবী বর ভেবে নিজের মনে একটু আধটু ভালবাসার খেলাও খেলেছে। কাঁচ মন হলেও বর-বৌ নিয়ে পুতুল খেলে এসেছে বহুদিন থেকে, ওরকম না হয়েই পারে না। তার মনের সেই আন্দোলনটুকু একেবারে উবে যায়নি, তলায় চাপা পড়ে আছে মাত্র।

একদিন বিনয় তার সেই পুরোনো স্মৃতিটাকে বেশ করে নাড়া দিয়ে দেয়।

তাদের বাড়ির নিচের তলায় গোলমাল একটু বেশি হয়। ওপরটা প্রায় সব সময়ই বেশ নির্জন থাকে। ওপরে সবই প্রায় শোবার ঘর, সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ও মাঝের দুপুরটা বাদ দিয়ে তাই কারুর ওপরে ওঠবার বেশি প্রয়োজন হয় না। নির্জন বলে দোতলায় একটা ঘর দখল করে বিনয় পড়াশোনা করে।

বকুল প্রায়ই আসে। খানিকক্ষণ নিচে তার মা'র সঙ্গে গল্প করে, খানিকক্ষণ উপরে তার কাছে কাটিয়ে যায়। তার কাছে সবদিন একা আসে না। তার ছোট বোন সাত বছরের মিনিকে টেনে নিয়ে আসে। মিনি চঞ্চল, দশ মিনিট দাদার ঘরে থেকেই চম্পট দেয়। আরও দু'চার মিনিট বসে বকুলও পালায়।

দেখে সে খুশি হয়ে ওঠে। নির্জনে তার সঙ্গে গল্প করতে বকুলের এই সঙ্কোচ দেখে মোটেই ক্ষুন্ন হয় না। সে জানে, যে মনোভাব ঐ সঙ্কোচটাকে জাগিয়ে তোলে, সে মনোভাব তার সঙ্কল্প সাধনে অনেক সহায়তা করবে। বকুল বোঝে, যত পরিচয়ই থাক, তার সঙ্গে নির্জনে গল্প করাটা দশজনের চোখে লাগবে। ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে মিশলেও সে পর। ছেলেবেলাকার কথা আলাদা, এখন আর সেদিন নেই। বকুল জানে, যৌবন এসে দু'জনের অতীতের সেই নিঃসঙ্কোচ মেলামেশাকে বাতিল করে দিয়ে তাদের মাঝে একটা ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে।

বকুলের ভিতরে এই মনোভাবের বিকাশ দেখে সে খুশি হয়। এটা শুভ লক্ষণ!

সেদিন সন্ধ্যা উতরে গেছে। অভয় হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, নিচে তার পড়ার ঘরে খুব চেঁচাচ্ছিল।

বিনয় আলো জ্বালেনি। অন্ধকারে ভূতের মত বসে ভাবছিল, আজ যদি বকুল আসে, এক পা এগোবে কি না?

বকুল দরজার কাছ থেকে ঘর অন্ধকার দেখে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আধা সন্দিহান হয়ে ডাকে, বিনয়দা ?

ঃ এসো।

বকুল ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে সুইচটা টিপে দিয়ে বলে, অন্ধকারে বসে আছ যে বড় ?

বিনয় মুখে অপরূপে বিষাদের ভাব ফুটিয়ে বলে, মনটা ভাল নেই বকুল !

ঃ মনের আবার কি হল ?

ঃ না এমনি !

জানা কথাই যে, 'না এমনি' শুনে বকুল ছাড়বে না. প্রকৃত কারণটা তাকে খুলে বলতেই হবে।

ঃ কি হয়েছে বিনয়দা ?

ঃ কিছু না, হবে আবার কি ? আচ্ছা বকুল, তুমি আবার স্কুলে ভর্তি হও না কেন ? দিব্যি পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারতে।

বকুল বলে, সে কথার জবাব দিচ্ছি পরে, আগে বল তোমার মন কেন ভাল নেই ?

বিনয় চুপ করে থাকে।

বকুল অনুযোগ দিয়ে বলে, বলবে না বিনয়দা ? লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি, বল।

ঃ কি হবে শুনে বকুল ? সে সব অতীতের কথা তুলে আর কাজ নেই। সব চুকে গেছে। তোমার সে বইটা পড়া হল ? বন্ধুর বই, ফেরত দিতে হবে শিগ্‌গির।

তার প্রত্যেকটি কথায় অন্তরের অপরিসীম বেদনা যেন ঝরে পড়ে। বকুলের নারী অন্তর বোধহয় বহুদূর থেকে ভেসে আসা গানের সুরের মত একটা অস্পষ্ট অনুভূতির সাড়া পায়। তার হৃদয় যে একটা শঙ্কিত চাঞ্চল্যে ভরে গেছে বিনয় তা বুঝতে পারে।

খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বলে, তোমার কি হয়েছে বল তো বিনয়দা ? দিন দিন তুমি যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছ। তোমার মুখ দেখলেই মনে হয় কি যেন তুমি বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছ। কিসের দুঃখ তোমার বিনয়দা, আমায় বলবে না ? আমি ছেলেমানুষ নই, আমি বুঝব, তুমি বলো।

একটু চুপ করে থেকে বিনয় বলে, তোমায় বলা সঙ্গত হবে কি না জানি না। কিন্তু না বলেও আমি থাকতে পারছি না। তুমি জান না তোমার জন্য আমি দিনরাত কী বেদনা বুকে নিয়ে বেড়াই !

বকুলের মুখ পাণ্ডুর হয়ে যায়। বিনয়ের দ্বিতীয় উক্তি যেন বজ্র হয়ে তার মাথায় ভেঙ্গে পড়বে, এমন একটা আশঙ্কার ভাব তার মুখে ফুটে ওঠে। উদ্বেগ, ভয় এবং চাপা উত্তেজনার অভিব্যঞ্জনায় তার চোখ দুটি অপরূপ হয়ে ওঠে।

বোঝা যায়, সে কি ভাবছে। তার মুখে প্রেম নিবেদনের প্রথম উক্তিটা শুনেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিনয়দা, তার বিনয়দা, এমন মুক্তকণ্ঠে তাকে প্রেম নিবেদন করছে ! এ তো গেল প্রথম ইঙ্গিত, এরপর বিনয় যখন স্পষ্ট করে মনের কথা উচ্চারণ করবে, তখন সে করবে কি ?

তার এই ভাব দেখে মনে মনে খুশি হয়ে বিনয় বলে, আজ আমি সারাদিন কি ভেবেছি জান ? তোমার কথা !

এবার বকুল টেবিলের ওপর দু'হাতে মুখ গুঁজে বলে, তোমার পায়ে পড়ি বিনয়দা, অন্য কথা বল। তোমায় আমি ভক্তি করি, তুমি যদি ওকথা বলো—

দরজার দিকে একবার চেয়ে বকুলের মাথাটা জোর করে উঁচু করে ধরে বিনয় বলে, তোমায় শুনতেই হবে, নাহলে আমার এতটুকু শান্তি থাকবে না। তোমার বিধবা বেশ দেখে আমার কি মনে হয় জান ? মনে হয়, তোমার এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী আমি। আমার জন্যই তোমার এই দশা।

বকুল এ'কথাটা আশা করেনি। সে যা আশঙ্কা করছিল তার বদলে এই অদ্ভুত কথাটা শুনে তার মুখে অপরিসীম বিস্ময় ও লজ্জার ছবি একসঙ্গে ফুটে ওঠে। একটা সোনার হারকে সাপ মনে করে চিৎকারে সকলকে সন্ত্রস্ত করে তুলে কেউ যদি দেখতে পায় সেটা সাপ নয়, তখন তার যেরকম লজ্জা হয়, বকুলও সেই রকম লজ্জা পেয়েছে। লজ্জায় মরে গিয়ে সে ভাবছে, ছি ! ছি ! আগাগোড়া না শুনেই বিনয়দার সম্বন্ধে এমন কথাটা ভেবে বসলাম !

সামলে নেবার জন্য খানিক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বকুল জিজ্ঞাসা করে, আমার কপালের জন্য তুমি দায়ী ? কি বলছ বিনয়দা ?

আমার কেবলই মনে হচ্ছে, মা যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেছিলেন তখন যদি রাজি হতাম, তবে তোমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম হ'ত। আজ একথা ভাবছি আর আমার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। একদিন তোমার জীবনটা বিফল হয়ে যাওয়া বন্ধ করবার সুযোগ আমি হারিয়েছি। মরলেও আমার এ দুঃখ যাবে না !

শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুতীব্র অন্তর্জ্বালা ধ্বনিত হয়ে ওঠে যে শুনে বকুলের চোখে জল আসে।

তার কথা শুনে বকুলের মধ্যে যে ভাব-তরঙ্গ উঠবে বিনয় পূর্বেই মোটামুটি জানত। তার মনে এই কথাটাই অন্য সব কথা ছাপিয়ে উঠবে যে তার দুর্ভাগ্যের জন্য তার বিনয়দা মর্মান্তিক যাতনা ভোগ করছে। তার বৈধব্যের দুঃখের কথা স্মরণ করে বিনয়দার মর্ম-বেদনার অন্ত নেই। বিনয়দা তাকে এত ভালবাসে যে কবে কোন্ অতীতে তার এই অচিন্তিত দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার সুযোগ হারিয়েছিল বলে আজ অনুতাপে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার কঠিন ভাগ্যলিপি মুছে দিতে পারছে না বলে বিনয়দার অতলস্পর্শী ভালবাসা বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এখন প্রাণ দিয়েও তাকে সুখী করতে পারবে না জেনে তার বিনয়দার দুঃখের সীমা নেই !

কতক্ষণ ম্লান মুখে নীরবে মুখের দিকে চেয়ে থেকে বকুল এগিয়ে এসে ডান হাতটি তার দুই হাতের মুঠোয় গ্রহণ করে বলে, আমার একটা কথা রাখবে বিনয়দা ?

বিনয় নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ঃ ও নিয়ে তুমি দুঃখ করো না। আমার দুঃখ তুমি যত বড় মনে করছ, বাস্তবিক তত বড় নয়। তোমরা কেউ জান না বিনয়দা, আমার চেয়ে তার কাছে আমার দেহটার

দাম ছিল বেশি। আমার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে তুমি যদি মন খারাপ কর তাতেই আমি বেশি দুঃখ পাব। বল, ও-কথা আর ভাববে না ?

এ একটা খবর বটে! বকুলের চেয়ে সতীশের কাছে তার দেহের দাম ছিল বেশি। তবে তো বকুলের হৃদয় মন জয় করার কাজ আরও সহজ হয়ে গেল!

তার এই স্বীকারোক্তি, যার অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় যে, সে তার স্বামীকে তেমন ভাবে ভালবাসতে পারেনি, কারণ তার চেয়ে তার দেহের দাম তার স্বামীর কাছে বেশি ছিল, এই স্বীকারোক্তি বকুল উচ্চারণ করতে চেয়েছে তার কথা ভেবে, সে যে দুঃখ পায় সেই দুঃখের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে। কত বড় একটা ভালবাসাই না তার দুর্ভাগ্যের জন্য বেদনা সঞ্চারিত করে তুলেছে, এই ভেবে সে নারী হয়েও একথা উচ্চারণ করতে সাহস করল! তার মনে হচ্ছে এত বড় ভালবাসার, এতখানি স্নেহের মর্যাদা সে না রেখেই পারে না। তাই যে গোপন কথা নারীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে চিরদিন গোপন হয়েই থাকে, সেই কথাও সে তাকে স্বচ্ছন্দে জানিয়ে দিল।

ঃ কিন্তু বকুল—

বকুল বাধা দিয়ে বলে, আর কিন্তু নয় বিনয়দা। এ-বিষয়ে আর একটি কথা তুমি ভাবতেও পারবে না, বলতেও পারবে না। তোমার সঙ্গে তাহলে আমি আড়ি করে দেব। সেই ছেলেবেলা যেমন আড়ি করতাম, মনে নেই ?

এর পরে তাদের কথা বেশ সহজ হয়ে আসে। খানিক পরে বকুল চলে যায়, যাবার সময় বলে যায়, তোমার কাছে আর আসব না বিনয়দা, তুমি ভারী দুষ্টু হয়ে উঠেছ!

কথাটার অনেক রকম মানে হয়। সে যে কি ভেবে কথাটা বলে গেল বুঝে বিনয় খুশি হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালেই বকুল এসে হাজির।

বিনয় ছোট ভাই অভয়কে একটা পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

ঃ ইস! বিনয়দার যে আবার মাস্টারিও করা হয় ?

ঃ সেটা কি আজকে জানলে নাকি ? কত পড়া বলিয়ে নিতে, সব ভুলে গেছ ? কৃতজ্ঞতা বটে!

ঃ থাক্ আর বলো না। একটু পড়া বলে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিতে, ভুলে গেছ ? কৃতজ্ঞতা বটে!

সহজ সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার। জড়তার চিহ্নটুকুও নেই। এমনিভাবে দিন সাতেক কেটে যায়। তারপর একদিন বিনয় আর এক পা এগোয়।

সকালবেলা একটা বই হাতে করে বকুল ঘরে ঢুকতেই বলে, তুমি আর আমার কাছে এসো না বকুল।

বকুল হেসে বলে, কেন বলুন তো মশাই ? কি অপরাধ করলাম হুজুরের কাছে ?

বিনয় গম্ভীর হয়ে বলে, না, সত্যি বকুল, কয়েকজন বন্ধু ভারী জ্বালাতে শুরু

করেছে। কি বলছে শুনবে? বলছে—শেষে তুই কি বিধবা বিয়ে করবি নাকি বিনয়?

ঃ তোমার বন্ধুদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। তোমারও কি তাই ইচ্ছে নাকি?

ঃ সে কি তুমি জান না বকুল?

ঃ জানি বৌঁক! তা বেশ তো, আমার আপত্তি নেই।

ঃ তোমার তো সাহস কম নয়! তোমার কথাটা সত্যি মনে করে যদি আমি—

বকুল হেসে বলে, তাহলে লাভ তো আমারই! তোমার ভাগ্যেই বরং একটা উচ্ছিষ্ট ফল জুটবে। দিন দিন তুমি যা ফাজিল হয়ে উঠছ বিনয়দা, তোমার কিছু শাস্তির ব্যবস্থা না করলে চলছে না!

একটু চুপ করে থেকে হাসি বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে বলে, ছিঃ, বিধবাকে ওসব কথা বলতে নেই! বন্ধুরা বলুক, আমি গ্রাহ্য করি না।

প্রথমে বকুল যেরকম সহজভাবে পরিহাসচ্ছলে কথাটা গ্রহণ করেছিল তা দেখে বিনয়ের ভয় হয়েছিল যে আজ বুঝি এক পা এগোনো হল না। তার শেষের কথাটা শুনে সে ভয়টা কেটে যায়। বোঝা যায় কথাটা তাকে ঘা দিয়েছে এবং এরপর মাঝে মাঝে এ কথাটা সে চিন্তা না করে পারবে না। তার ফলে কত অসতর্ক মুহূর্তে তার তরুণ মন কল্পনায় কত মায়াময় স্বপ্নই না রচনা করবে!

মনকে তো কেউ বেঁধে রাখতে পারে না!

বিনয় ভাবে, এইবার কথাটাকে হাল্কা পরিহাসের রূপ দিয়ে সহজ করে আনতে হবে।

বুকে হাত দিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে, আমার বুক ভেঙে গেছে বকুল। তুমি এত নিষ্ঠুর! কোথায় ভাবছি—

বকুল খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, ধ্যেৎ, তোমায় দাদা বলি না? বেশ ঠাট্টা শিখেছ!

ঃ দাদা বলো? কখ্খনো না। তুমি তো আমার নাম ধরে ডাকো! লোকে কি মনে করবে তাই নামের পেছনে একটা দা' যোগ করে দাও। ও দা'র মানে কাটারিও হতে পারে।

হঠাৎ কি ভেবে মুখ লাল হয়ে ওঠে বকুলের, বলে, আচ্ছা এবার থেকে শুধু দাদা বলবো।

ঃ খবরদার, অমন কাজও করো না। অমনভাবে রাস্তা বন্ধ করে রাখবে, শেষকালে যদি—

কথাটা বকুল শেষ করতে দেয় না—তোমার ঘাড়ে আজ ভূত চেপেছে বিনয়দা, পালাই।

ব'লে ব্রীড়া সঙ্কোচের অপূর্ব হিল্লোল তুলে চলে যায়।

বিনয়ের বুক ভরে ওঠে। প্রাণে আনন্দের বীণা বেজে ওঠে। মুগ্ধ নয়নে একাগ্রভাবে বকুলের গতিচ্ছন্দে অপরূপ সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে থাকে।

দুই

কে জানত অজিত এরকম মানুষ !

কে ভাবতে পেরেছিল এমন করে মন ভুলিয়ে, তাকে একেবারে বোকা বানিয়ে, এতদিন খেলা করে এমনভাবে কেটে পড়বে !

বোকা হাবা নয়।

গরিব বাপের কলেজে-পড়া সংসারের অনেক ঘা খাওয়া পাকা পোক্ত মেয়ে। তবু সে ধরতে পারল না অজিতের প্রেমের ছলনা, ভালবাসার মিথ্যা অভিনয়।

অথবা— ?

তার অজান্তে কোন অঘটন ঘটেছে ?

নিজে সে মারাত্মক কোন ভুল করে মনটা হঠাৎ বিগড়ে দিয়েছে অজিতের ? না জেনে না বুঝে সাংঘাতিক রকম কোন দোষ করে বসেছে, অজিত যা ক্ষমা করতে পারছে না ?

নইলে কি করে এটা সম্ভব হয় !

ফাঁকা বাজে ভাবপ্রবণতার ব্যাপার তো নয় !

বছরখানেক উমা সাবধান ছিল।

তারপর মনপ্রাণ একাকার হয়ে গিয়েছে টের পেয়েও কয়েকমাস সতর্কতার জের টেনেছিল।

কলেজের উচ্চতর পরীক্ষাটা দিয়ে পাস করা পর্যন্ত।

তারপর করেছিল বোঝাপড়া।

অর্থাৎ অজিত যা বলে তাই মেনে নিয়েছিল।

দ্বিধা হয়নি।

সংশয় জাগেনি।

ভাবনা হয়নি।

কলেজের তৃতীয় বছরের পড়ার খরচটা একরকম অজিত যুগিয়েছে।

নইলে তার পড়া বন্ধ হয়ে যেত।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাই।

আর সে পড়বে না।

তার বাবার সাধ্য নেই আর তাকে পড়ায়।

খবরটা অজিত কিভাবে নিয়েছিল আজও তার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবরণ উমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে।

টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন সন্ধ্যায়।

অজিত আসে ধুতি পাঞ্জাবি পরে জামাইবাবু সেজে—ডান হাতের আস্তিনের ডগাটা বুঝি একটু ভিজেছে।

গাড়িতে খুলে রেখে এসেছে দামী রেন-কোট। জিনিসটা সত্যই দামী, গায়ে চাপিয়ে তিন দিন তিন রাত্রি ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে শ্রাবণের ধারাবর্ষণ উপভোগ করা চলে, গায়ে একটু জল না লাগিয়ে।

কয়েকটা বই কিনে দিয়েছে। মাঝে মাঝে শাড়ি ব্লাউজ উপহার দিয়ে তার কলেজ যাওয়ার বিপদ সামলেছে।

সোজাসুজি নয়।

নানা উপলক্ষ সৃষ্টি করে।

সে আর পড়বে না শুনেই অজিত যেন বোমার মত ফেটে যায়! স্বামীর মত, বাপের মত, জন্ম-জন্মান্তরের পরমাত্মীয়ের মত!

অভিনয় করে নয়—আন্তরিকতার সঙ্গেই।

তাতে আজও উমার সন্দেহ নেই।

অজিত তীব্র চাপা কণ্ঠে বলে, তোমার মত মেয়েকে কেটে কুচি-কুচি করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া উচিত। আমায় তুমি ঠকিয়েছ। থার্ড ইয়ারে যে মেয়ে চাপে পড়লেই পড়া সাঙ্গ করে দেয়, সেরকম গেঁয়ো সেকেলে মেয়েকে আমি তো শ্রদ্ধা করতে পারব না। শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা হয় না উমা।

উমা চুপ করে থাকে।

হঠাৎ যেন উদার হয়ে ক্ষমার সুরে অজিত বলে, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না ঠিক। মনে আছে? বলেছিলে, তুমি শুধু পরীক্ষা পাস করে শেষ করবে না, একটা ডক্টরেট আদায় করা পর্যন্ত খাটবে? এই বুঝি তার নমুনা?

খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে উমা বলে, কি করব, উপায় নেই। বাবা আর টানতে পারছেন না।

ম্লান হয়ে যায় অজিতের মুখ।

ঃ আমি তোমায় পড়াব।

উমা চুপ করে থাকে।

ঃ তোমার পড়ার সমস্ত খরচ আমি দেব।

তবু উমা চুপ করে থাকে।

অজিত রুমাল দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে তার কপাল আর মাথার তালুতে কয়েকবার হাত বুলিয়ে সস্নেহ হাসির সঙ্গে বলে, তুমি কি ভাবছ জানি। বিয়েটা চুকিয়ে নিয়ে মালিক হয়ে পড়ালেই হয়—কেউ তো জিজ্ঞাসা করতে আসবে না বৌকে কেন এত বিদুষী করছ—হাঁড়ি ঠেলতে দিচ্ছ না?

ঃ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে। এমন আচমকা তুমি কথাটা বললে!

ঃ স্বামীর খরচে পড়া চালিয়ে যাবার কথা ভেবে মাথা ঘোরবার কি আছে? বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে উমা। তোমাকে ছাড়া আর কোন বৌ কি এ জীবনে আর চাইতে পারব? অন্য কারোর কথা ভাবতে পারব? সামাজিক অনুষ্ঠানটা শুধু পিছিয়ে দিচ্ছি বাপ দাদা কাকা জেঠা মেসো পিসের খাতিরে। আজ তোমায় ঘরে নিতে চাইলে বাড়িতে একটা খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যাবে— বিশ্রী ব্যাপার দাঁড়াবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে আমাকেই। আমি আজও পরাধীন জান তো?

ঃ জানি।

ঃ বাবার মোটরে চাপি, বাবার ঘাড়ে খাই, বাবা টাকা ঢেলে প্রভাব খাটিয়ে ঠেলছেন বলেই ওঠবার আশা। আমি একটু গুছিয়ে নেওয়া পর্যন্ত তোমায় আমায় অপেক্ষা করতেই হবে।

ঃ সত্যি, পরাধীন হওয়ার চেয়ে ঝঞ্ঝাট আর নেই।

ঃ তাইতো বলছি, ধরে নাও আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি আমার দিক গুছোই, তুমি তোমার দিক গুছোও। অনুষ্ঠানটা নয় পরেই হবে! শুধু বি-এ পাস নয়, এম-এ পাস নয়—একেবারে ডক্টরেট পাস করা মেয়ে! ঘরের কোণে বসে বিদ্যা খাটালে দু'চারশো টাকা রোজগার হবে। কেউ কথাটি বলবে না।

ঃ আগে তো কোনদিন বলনি এসব কথা?

ঃ দরকার হয়নি—তাই বলিনি।

উমা খানিকক্ষণ চুপচাপ ভাবে। তার ভাবনাও বাপ-দাদা আপনজনদের নিয়েই। কে জানে ওরা কিভাবে নেবে ব্যাপারটা!

ঃ বেশ। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।

পরীক্ষার ফল বার হল। নিজের অসামান্য কৃতিত্বের জন্য এতটুকু অহঙ্কার জাগল না উমার।

এ কৃতিত্বের আসল মানে তার ভাল ভাবেই জানা ছিল।

শুধু খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অজিতের গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রেখে বলেছিল, তুমি যদি চাও, আমি বিলেত গিয়ে তোমার মুখ রক্ষা করব। আরও খাটব—আরও ভালো রেজাল্ট করব।

ক'দিন কেটেছিল তারপর?

একরকম বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

অজিত ক'দিন আসেনি বলে সে শুধু একটু চিন্তায় পড়েছিল, পাশের বাড়ি থেকে টেলিফোন করেছিল অজিতকে।

অজিত ভালোই আছে—কাজে খুব ব্যস্ত। দু'একদিনের মধ্যে সময় করে দেখা করতে আসবে।

একটু ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা মনে হয়েছিল অজিতের টেলিফোনের আলাপ।

নিজে আসেনি। পাঠিয়েছিল চিঠি।

অজিতের মন ভেঙ্গে গেছে। সে বিশ্বাস করে না জগতে ভালবাসা বলে কিছু আছে। সব ফাঁকির কথা। সব বানানো কথা, মিছে কথা।

উমা যেন তাকে ক্ষমা করে। চিরদিনের জন্য মন থেকে মুছে ফেলে দেয় তার স্মৃতি।

এ জীবনে সে আর কোন মেয়ের ধারে কাছে ঘেঁষবে না!

এই চিঠি পেয়েও উমা অবশ্য কল্পনা করতে পারেনি ব্যাপার সত্যি সত্যি কত গুরুতর!

মনে মনে একটু হেসে ভেবেছিল, অজিত একটু মজা করছে তার সঙ্গে, খেলা করছে।

দিন যায়, হপ্তা কাটে।

তবু ব্যাকুল হবার বদলে উমা মনে মনে হাসে।

সে-ও মজা করবে অজিতের সঙ্গে। চুপচাপ থাকবে।

দেখা যাক্, ক'দিন অজিত না এসে থাকতে পারে!

দিন পনেরো পরে তার টনক নড়েছিল।

অজিতের কি খেয়াল নেই তার পড়াশোনার কথা?

টাকা দিয়ে তার উঁচু পাসের ফাঁদে ঢোকার প্রয়োজনের কথা, বই-পত্র কেনার জরুরী কথা?

হার মেনে নিজেই গিয়েছিল অজিতের কাছে।

হয়তো কোন কারণে সত্যিই দারুণ অভিমান হয়েছে অজিতের।

নিজে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসা ভাল।

কি রুক্ষ অথচ ম্লান অজিতের মুখ।

যেন কঠিন কোন অসুখে ভুগছে।

ঃ আমার চিঠি পাওনি?

ঃ চিঠি পেয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার? এমন চেহারা হয়েছে কেন?

তার ব্যাকুল প্রশ্নের ধাক্কা সামলাতে কি অজিত ক্ষণকালের জন্য চোখ বুজেছিল? একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেছিল?

ঃ এমন স্পষ্ট করে লিখলাম, তবু বুঝলে না? ভালবাসায় আমার ঘেন্না জন্মে গেছে। আমি আর ওসবের মধ্যে নেই।

ঃ বেশ তো। ভালবাসা বাদ দাও। বিয়ে করা বৌটাকে বাদ দিচ্ছ কেন?

ঃ আমি তোমার প্রেমকে বিয়ে করেছিলাম—তোমাকে নয়। প্রেম মিথ্যা বলে আমাদের বিয়েটাও মিথ্যা হয়ে গেছে।

উমা হঠাৎ রেগে গিয়েছিল।

ঃ তার মানে? আমায় নিয়ে কিছুদিন খেলা করলে—সাধ মিটে গেছে তাই এখন পাশ কাটাচ্ছ? প্রেমে নয় তোমার ঘেন্না ধরে গেছে, কিন্তু শুধু প্রেম তো তুমি আদায় করনি আমার কাছে?

ঃ দাম দিয়েছি।

ঃ দাম দিয়েছ মানে? আমি কি টাকার দাম নিয়ে—

উমা কেঁদে ফেলেছিল।

ঃ আমি তোমায় খারাপ মেয়ে বলছি না উমা, আমি শুধু বলছি—আমাদের ভালবাসা হয়নি, আমরা শুধু ভালবাসার অভিনয় করেছি।

ঃ অভিনয়? সহজ করে সোজা কথায় বল না কি বলতে চাইছ?

অজিত গভীর খেদের সুরে বলেছিল, তোমার দোষ নেই—আমারও দোষ নেই। তোমার অবস্থায় কোন মেয়ের পক্ষে কোন পুরুষকে ভালবাসা অসম্ভব। আমার পক্ষেও তাই। আমার পক্ষেও কোন মেয়ের সঙ্গে সত্যিকারের প্রেমে পড়া অসম্ভব। প্রেমের গোড়ার 'এ'-কারটাও তোমার আমার আয়ত্তে নেই—ওটুকুও আমরা বুঝি না।

উমা নীরবে চেয়েছিল।

ঃ আমি কর্তা—আমি তোমায় খেলাব নাচাব খাটাব পড়াব ভোগ করব—তোমাকে তাই মানতে হবে। এভাবে কি প্রেম হয়? সমানে সমানে ছাড়া?

এবার উমা একটু হেসেছিল।

ঃ বুঝলাম। আমাদের প্রেম হয়নি, আমরা একটু খেলা করেছি, প্রেমের নামে একটু ইয়ার্কি দিয়েছি। অবস্থাটা মানতে হবে তো? উড়িয়ে দিলে তো চলবে না? অবস্থা অনুসারে একটা ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে তো?

ঃ ব্যবস্থা তো আমি করে দিয়েছি সব।

ঃ আমায় না জানিয়েই? কি ব্যবস্থা করেছ?

ঃ ওহো—তাই তো! ব্যবস্থা সব করেছি কিন্তু তোমায় তো পাঠাতে ভুলে গিয়েছি কাগজ-পত্রগুলো।

অজিত কাগজ-পত্রগুলো বার করে দিয়েছিল।

শুধু কয়েকটা সই করে কয়েকটা কাগজ যথাস্থানে জমা দিয়ে উমা উচ্চতর পড়া শুরু করতে পারবে, টাকা-পয়সা সব জমা দেওয়া হয়েছে।

একটা কাগজ নিয়ে নামকরা একটা বইয়ের দোকানে গেলেই তার দরকারী সব বই পাবে—বাড়তি পাঁচ সাতখানা বইও ইচ্ছা হলে কিনতে পারবে।

তারপর অজিত জোর দিয়ে আবেগের সঙ্গে বলেছিল, তুমি তো জানো, আমি সেরকম লম্পট নই। আমি কোন মেয়ের সঙ্গে কখনো খেলা করিনি। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। সামাজিক বিয়ের ফাঁদে পড়লে আমরা দু'জনেই চিরজীবনের জন্য ফাঁপড়ে পড়ব—অসুখী হব।

অজিত একটু থেমেছিল।

উমা কথা কয়নি।

ঃ বিয়ের পর হয়তো আমি বিগড়ে যাব। বাইরে মদ বেশ্যায় মুক্তি খুঁজব। কেঁদে

কেঁদে তোমার দিন যাবে। শুধু মনের দুঃখে নয়, মাতাল স্বামীর গালাগালি মারপিট খেয়ে কেঁদে কেঁদে।

অজিত আবার থেমেছিল।

উমা এবারও মুখ খোলেনি।

ঃ তাই বলছি কি—হ্যাঁ, আমাদের বিয়ে হয়েছে। তুমি ধরে নাও যে বিধবা হয়েছ। আজকাল বিধবা হওয়াটা পাপ নয়, মৃত স্বামীর টাকা কাজে লাগানো দোষের নয়—আর একজনকে বিয়ে করাও বে-আইনী নয়।

উমা তবু চুপ করেছিল।

ঃ তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। যা ইচ্ছা মানে পড়াশোনার ব্যাপারে। বিলেতে যেতে চাও, যেও - তোমার মৃত স্বামী সব ব্যবস্থা করে রাখবে।

এবার মুখ খুলেছিল উমা।

ঃ একটু চুপ করবে? একটু আমায় ভাবতে দেবে?

একটু ভাববার সময় আর সুযোগ! একটু ভেবেই যেন মানে খুঁজে পাওয়া যায় এসব ভাবনার!

অনেক ভেবে উমাকে ঠিক করতে হয়েছিল - সে নীতি ভাঙবে না, সস্তা অভিমানে সে চুরমার করে দেবে না দু'জনের জীবন।

অজিতের নিশ্চয় এটা সাময়িক বিকার। একটা মানসিক অসুখ।

স্বামীর অসুখকে সে বড় করবে না।

তার অবশ্য করার কিছুই নেই। এ মানসিক বিকারের কোন চিকিৎসাই সে জানে না জানলেও সে চিকিৎসা খাটাবার তার সাধ্য নেই।

•

ক্রমে ক্রমে সে টের পায় তার জন্য এতটুকু আকর্ষণ সত্যই আর অজিতের নেই।

তার মুখ দেখার সাধও আর তার জাগে না।

দেশের উঁচু পড়া দু'বছর সে পড়ল -- ব্যবস্থা করে গেল অজিত।

পয়সা-কড়ি রেখে যাওয়া মৃত স্বামীর মতই আড়ালে থেকে, দূরান্তরে থেকে।

উমা ইচ্ছে করলে বিলেতে গিয়েও দু'এক বছর পড়ে আসতে পারে।

কিন্তু ঘেন্না জন্মে গেল উমারও।

মৃত স্বামী?

ভাল কথা।

প্রেতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত নয়!

এবার কি করবে তাই নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঝপ করে একটা চাকরি জুটে যায় উমার।

একরকম ঘরে বসে জুটে যায়।

চেষ্টা না করেই।

বিনা আহ্বানে যেচে যেন বাড়ীতে উড়ে আসে মাসে মাসে বেতন প্রসব করা চাকরি-রূপী সোনার হংসী।

উমা টের পায় কারসাজিটা অজিতের।

সে বিগড়ে গিয়ে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করতে পারে ভেবে, অজিত সামনে থেকে চাকরিটা তাকে করিয়ে দেয়নি—নিজে আড়ালে থেকে ব্যবস্থা করেছে।

বিলেত ঘুরিয়ে এনে বিদুষী করে সারাজীবন খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখার দায় মেনে নিয়ে, বিয়ে-না-করা স্বামী হয়ে—সব দায় থেকে রেহাই পেয়েও অজিত তবুও স্বস্তি পাচ্ছে না!

ভিতরে বিবেকের পোকা কামড়াচ্ছে! অথবা—?

উমা ইতস্ততঃ করে—ছটফট করতে করতে ভাবে।

অজিতের দয়ার দান চাকরিটা নেবে? এ চাকরি করতে গিয়ে মনের পোকার কামড়ে তার যদি রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যায়—নিজেকে বাজারের বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়েমানুষ মনে করে যদি দিনরাত ঘেন্নায় তার গা ঘিন ঘিন করে?

হরিপ্রসন্ন ক্লিষ্টমুখে বহুকাল পরে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করতে করতে বলে; অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিয়েছিস? আমায় একবার দেখালি না?

তখনও উমা দরখাস্ত পেশ করেনি—ইতস্ততঃ করছে। কিন্তু বাপের কাছে সে-কথাটা ফাঁশ করে আর লাভ কি?

বুড়ো মানুষ—হয়তো হার্টফেল করে বসবে!

সে তাচ্ছিল্যভরে বলে, ও আবার তোমায় কি দেখাব! একটা অ্যাপ্লিকেশন কি লিখতে শিখিনি?

হরিপ্রসন্ন নিজের মনে বলে যায়, চন্দর সত্যি মান রেখেছে! পেটে একটু বিদ্যে ঢুকোতে রোজ দু'তিন ঘণ্টা কি যুদ্ধটাই করতাম—কলেজের পড়া পড়ব কি! কতবার তোকে বলেছি না ফার্স্ট হয়ে চলেছিস বলে অহঙ্কার করিস নে উমা? কত ছেলেমেয়ে আছে, অবস্থার ফেরে তোর সাথে পাল্লা দিতে পারছে না।

মুখে আবার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলে, চন্দরকে পড়িয়ে পড়া চালাতে হত, নইলে তোর বাবাও কি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারত না ভেবেছিস!

উমা তবু দ্বিধা করে। হরিপ্রসন্নের পুরোনো ছাত্র চন্দ্রনাথ নিজের অফিসে চাকরিটা তাকে দিচ্ছে বটে, কিন্তু উমার তো অজানা নেই আসলে চাকরিটা গছিয়ে দিচ্ছে কে!

চন্দ্রনাথের পত্র আসে হরিপ্রসন্নের নামে।

তার মেয়েকে অফিসে একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে লিখে পাঠিয়েছিল—এখনো দরখাস্ত পৌঁছয়নি কেন? হরিপ্রসন্ন ছিল তার ছেলেবেলার মাস্টার—তাই সে তার এই উপকারটা করছে।

দু'দিনের মধ্যে উমা গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করে না এলে সে অগত্যা বাধ্য হয়েই অন্য কাউকে কাজ দিয়ে দেবে। কয়েকটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেছে চন্দ্রনাথ।

মেয়েকে চাকরি করতে দেবার ইচ্ছা কি নেই হরিপ্রসন্নের ?

সে কি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছে ?

হরিপ্রসন্ন ছিল স্কুলে। পিয়ন বই-এ সই করে উমাই রেখেছিল চিঠিটা !

তার সম্পর্কে চন্দ্রনাথের প্রশ্নগুলি চন্দ্রনাথেরই অথবা অজিতের সেটা উমা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু আর সে দ্বিধা করে না।

একটা দরখাস্ত লিখে ফেলে নিয়ে খেয়ে বেরিয়ে যায়।

দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবার দেড় ঘণ্টা পরে চন্দ্রনাথ তাকে খাস কামরায় ডেকে পাঠায়।

ব্যাপারটা বুঝতে পারে উমা।

অজিতের খাতিরে ছেলেবেলার গৃহশিক্ষককে খাতির করলেও তার অফিসের মেয়ে-কেরানী তাকে সে খাতির করতে প্রস্তুত নয়।

একটু যেন স্বস্তি বোধ করে উমা।

চন্দ্রনাথকে প্রায় প্রৌঢ়-বয়সী বলা যায়।

তার কথাবার্তায় রকমসকম দেখে একেবারেই টের পাওয়া যায় না তার ভোঁতা মগজে একটু বিদ্যা প্রবেশ করাতে হরিপ্রসন্নকে একদিন রীতিমত যুদ্ধ করতে হত।

গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকায়। তারপর আবার মাথা নামিয়ে মিনিট পাঁচেক নিজের কাজ চালিয়ে যায়।

মাথা তুলে বলে, দরখাস্ত দিতে এতদিন দেরি করলে কেন ?

ঃ শরীর খারাপ ছিল।

ঃ সে খবরটা তুমি কিংবা তোমার বাবার তো জানানো উচিত ছিল আমাকে ?

এক মুহূর্তে উমা মন স্থির করে ফেলে।

স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আপনাকে সত্যি কথা খুলে বলি। বাবা জানেন, আমি অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে গিয়েছি। আমিই ইতস্ততঃ করছিলাম, চাকরি করব কি না।

একটু প্রসন্নভাবেই চন্দ্রনাথ এবার যেন তার দিকে তাকায়। মাথা নামিয়ে আবার মিনিট কয়েক নীরবে নিজের কাজ চালিয়ে যায়।

দামী পেনটা দামী দোয়াতদানীতে রেখে বলে, চাকরি করাই ঠিক করলে ? যাক্ গে, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার জানবার দরকার নেই। তোমার অ্যাপ্লিকেশন মঞ্জুর করার আগে তোমায় দু'একটা কথা বলে রাখছি।

একবার কেসে পাইপ ধরায়। পাইপ ধরিয়ে আরেকবার কাসে।

ঃ মাস্টার মশায়ের জন্য তোমাকে এই চাকরি দেওয়া—অনেক বেশী কোয়ালিফিকে-সান নিয়ে কত ছেলে হত্যা দিয়েছে তার সংখ্যা নেই। তবে তোমার কোয়ালিফিকেসানেই কাজ চলে যাবে--নইলে অবশ্য মাস্টার মশায়ের খাতিরেও এ কাজটার জন্য তোমায় ডাকতাম না।

উমার হাসি পায়।

নিজের ইচ্ছায় ছেলেবেলার মাস্টার তার বাবাকে খাতির করেই যেন চন্দ্রনাথ তাকে চাকরিটা দিচ্ছে !

অজিত যে নিজের বিবেকের চাপ সামলাতে, চাপ দিয়ে তাকে কাজটা দেওয়াচ্ছে, এটা যেন তার অজানা।

চন্দ্রনাথ বলে, খেটেখুটে কাজ কিন্তু তোমায় ঠিকমত করতে হবে কাজে ঢিলা দিলে আমি সইব না। এটা বলতে হল কি জন্য জান? তোমার বাবার জন্য তোমাকেই চাকরিটা দিলাম বলে তুমি হয়তো ভেবে বসবে—বাঃ, মজা করে বেশ আরামে দিন কাটাবার সুযোগ জুটেছে। ওটা কিন্তু চলবে না। কাজ ঠিকমত করতে হবে, নইলে—

উমা ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, আপনার কথা বুঝেছি। আমিও এসব ভেবেই ইতস্ততঃ করছিলাম—খাতিরের চাকরি ফাঁকির চাকরি করা আমার পোষাবে কিনা। আপনি সোজাসুজি জানালেন খাটতে হবে—তাতেই আমি বুকে বল পেলাম।

চন্দ্রনাথ একটু আশ্চর্য হয়েই এবার তার দিকে চেয়ে থাকে।

উমা বলে, আমি সারা মাস খাটব, আপনি মাসকাবারে মাইনে দেবেন, —তাহলে চাকরি নিতে আমার দ্বিধা নেই।

একটা শিশির ছিপি খোলার মত সহজে অদ্ভুত যন্ত্রটার মুখের ঢাকনি খুলে চন্দ্রনাথ ঠিক যেন সামনে দাঁড়ানো মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, এমনি স্বাভাবিক আওয়াজে জন পাঁচেকের নাম উচ্চারণ করে তার কামরায় আসতে বলে।

চার জনের পরনেই কোট খুলে রাখা প্যান্ট আর সার্টের পোশাক—কি বিশ্রী রকম রঙীন টাইগুলো।

একজনের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি —তার উপর কোট!

নিয়োগপত্রে সই করে উমার হাতে দিয়ে চন্দ্রনাথ বলে, ইনি কাল থেকে শম্ভুবাবুর পোস্টে কাজ শুরু করছেন। ওঁর বসার জন্য একটু স্পেশাল ব্যবস্থা করে দেবেন।

ছুটির সময় হরিপ্রসন্ন আসে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতা জানাতে তার কামরায় যায়।

চন্দ্রনাথ বলে, চলুন মাস্টার মশায়, আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। নিজের কাজেই বেরোচ্ছি—পথে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাব।

উমার দিকে চেয়ে হেসে বলে, আজ কিন্তু শেষ—কাল থেকে তোমার সঙ্গে আমার অফিসিয়াল সম্পর্ক। কাজে ফাঁকি দিলে, আব্দার করতে চাইলে চলবে না কিন্তু—কাজের বেলা আমি আত্মীয়-পোষণের ধার ধারি না।

উমাও হেসে বলে, আমি কি আহ্লাদী মেয়ে? কোনদিন আহ্লাদী হবার সুযোগ পেয়েছি? অনেক খেটেছি—খাটতে আমি জানি।

চন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে কামানো মুখে তীক্ষ্ণ হাসি হাসে।

ঃ তাও আমি জানি। নইলে যেচে তোমায় চাকরি দিতাম না। আমার ড্রাইভার লোকেশের কথা ধর—ব্যাটা খুব খাটতে পারে। সেই গুণের জন্যই ওকে রেখেছি। কাজ ঠিক মত করে যাবে, এমনিতে একেবারে পাগলাটে স্বভাব, শুধু সিগারেট ফুঁকবে আর

'দেশি' খাবে। তবু শুধু বাঙালী বাচ্চা বলে রেখেছি, বাঙালী হয়ে যদি না বাঙালী ছেলেকে বাঁচালাম, জীবনে তবে করলাম কি ?

উমা বসেছে একপাশে। মাঝখানে তার সত্যিকারের বাপ হরিপ্রসন্ন, তারপর তার বাপের মত চন্দ্রনাথ। এতদিন ছিল না, আজ সত্যিই পিতার সমতুল্য হয়েছে চন্দ্রনাথ।

সমতুল্য ?

হরিপ্রসন্ন তাকে জন্ম দিয়েছে, না খেয়ে মরতে দেয়নি, উলঙ্গ করে রাখেনি, শীতে বেশ খানিকটা অসুবিধা ঘটতে দিলেও বেশি কষ্ট পেতে দেয়নি।

কিন্তু ওই ছেলেবেলা পর্যন্ত ! তাকে মানুষ করতে হরিপ্রসন্ন কি করেছে হিসেব করার চেষ্টাও করে না উমা। যে প্রায় কিছুই করতে পারেনি, যার ক্ষমতায় কুলোয় নি, সে কতটুকু করেছে হিসাব করতে বসার মত নীচু মন তার নয়।

স্কুলে নীচু ক্লাশেই পড়া তার বন্ধ হয়ে যেত।

ঠিক দিদির মত সেই বয়স থেকে খেলে বেড়াবার সাথে টুকিটাকি ঘর-কন্নার কাজ করতে করতে ক্রমে ক্রমে ঘরের কোণে আটক হয়ে শুধু ঘর-কন্নার কাজটাই অবলম্বন করত, তারপর যথা নিয়মে একদিন চলে যেত আরেক বাড়িতে আরেক সংসারের ঘর-কন্নার কাজ করতে এবং বছর-খানেকের মধ্যে নেহাত প্রথমবার বলেই বাপের বাড়ি আসত জন্ম দিতে প্রথম ছেলে অথবা মেয়েটির।

উমা শিউরে ওঠে না। যখন তখন কথায় কথায় কারণে অকারণে রোমাঞ্চ বা শিহরণ জাগে না তার।

রাস্তা বন্ধ। গাড়ীকে থামতে হয়েছে।

মোটাসোটা নধর চেহারার গাইটি নির্বিকারভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, বিশালকায় ষাঁড়টি তার গা চাটছে। কে জানে লিনলিথগো সাহেব যে ষাঁড় ভারতকে উপহার দিয়েছিলেন এটি তারই কোন নিকট আত্মীয় কি না।

গাড়ী থামাতে হয়। ধীরে সুস্থে গো-জাতীয় প্রেমিক-প্রেমিকা দুটি পাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দেয়। হর্ণের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে কয়েকটা কুকুর সেখানে কামড়াকামড়ি করছিল। প্রকাণ্ড মোটা ষাঁড়টি মাথা নীচু করে শিং নাড়া দিতেই কুকুরগুলি কেঁউ কেঁউ করে ছুটে পালায়।

গাড়ী-চালক লোকেশকে রাগে গজ গজ করতে দেখে চন্দ্রনাথ হেসে বলে, রাগছ কেন, মাড়োয়ারীদের গরু নিশ্চয়। রাস্তা-ঘাট সব বেদখল করছে।

ঘটনাচক্র ?

ছাই !

গোপালমামার জন্য কলেজের প্রথম দু'বছর চলেছিল —তারপর চালানো গিয়েছিল অজিতের দয়ায় অথবা খেয়ালে।

এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা কিছুই নেই।

গোপালমামা আগেও অমন কতবার তাদের বাড়ী এসেছিল। সে যদি না থার্ড হত

ক্লাশের পরীক্ষায়, আরও পড়ার জন্য বায়না করে করে যদি না মার খেত মায়ের হাতে আর সেই গল্প কানে না যেত গোপালমামার, নিজে সে যদি না গোপালমামাকে বুঝিয়ে দিত যে সামান্য একটু ভুলের জন্য কিভাবে ফার্স্ট হওয়া ফসকে গিয়ে তাকেও থার্ড হতে হয়েছে, সারাক্ষণ যদি স্কুল, পড়া আর পরীক্ষার কথা বলে কান ঝালাপালা করে না দিত গোপালমামার--তাকে পড়াবার ঝোঁকটা কি আকাশ থেকে আসত তার ?

বৃত্তি না পেলে এবং স্কুল নিজের স্বার্থে তাকে বাগিয়ে রাখার জন্য ফ্রি-শিপ না দিলে গোপালমামাও কি উঁচুদিকের পড়ার মোটা খরচ বইতে রাজী হত ?

কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে যাই করে থাক আর গোপালমামারা যতই করে থাক তার জন্য, অজিত না থাকলে কতটুকু সার্থক হত তার এত কষ্টে এতগুলি পরীক্ষা পাস করা !

চাকরির চেষ্টা করতে নেমেই যেন দেয়ালে কপাল ঠুকে গিয়েছিল উমার।

নির্ভেজাল খাঁটী চাকরি শুধু জোটানোই কঠিন ব্যাপার নয়, ওরকম চাকরির বাজারে তার দাম অতি সামান্য। বেশী টাকার চাকরি হলে সেটা আবার ঠিক চাকরি নয়, মালিকের সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্কটাই আসল, চাকরিটা আনুষঙ্গিক।

অজিত তাকে দয়া না করলে, তাকে এই চাকরিটা জুটিয়ে না দিলে, কতদিনে কিভাবে নিজের খাঁটি মূল্য আদায় করতে পারত কে জানে !

সুতরাং উমার যে কৃতজ্ঞতার অভাব আছে তা নয় ! অজিতের জন্যই চাকরি—এটা তার জানা কথা। ওসব হিসাব নিকাশে সে ভাবপ্রবণতা টানে না। কিন্তু নিজের হিসাব কষবার সময় এই জানা কথাটাই সে অন্যভাবে ধরে। একজন এভাবে চাকরি করে দেবে এটাই সাধারণ নিয়ম। তার মূল্য আছে এটাই আসল কথা। মূল্যটা যে একজন পাইয়ে দিয়েছে সেটা আলাদা প্রশ্ন !

গলির মুখে চন্দ্রনাথ তাদের নামিয়ে দেয়। গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকবে না।

উমা বলে, নেমে একটু চা খেয়ে যাবেন না ?

ঃ শুধু যদি চা খাওয়াও তবে নামতে পারি।

ঃ তাই খাবেন।

হরিপ্রসন্নের বৈঠকখানা বলে কিছু নেই, দুখানা ঘরই সম্বল ন'জন মানুষের। উমার পড়াশোনার জন্যই শুধু একটি টেবিল আর চেয়ারকে ঘরে ঠাঁই দিতে হয়েছে।

এবার অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হবে। উমার নিজের জন্যই তো একখানা ঘর দরকার হবে এবার। বসন্ত এখানে থাকে না তাই এতদিন কোন রকমে চলে গিয়েছে। বিয়ে না করলেও কলকাতায় তার চাকরি হলে আগেই অন্য বাসা খুঁজে নিতে হত—চাকুরে ছেলেকে কি আর একটা ঘরে ভিড়ের মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকতে দেওয়া যেত !

এবার বাসা খুঁজতে হবে চাকুরে মেয়ের জন্য।

একঘরে ভাইবোনেরা সব সময় হৈ চৈ করবে, রাত্রে ক'জনের সাথে এক বিছানায় শোবে—এভাবে কেউ আড়াইশ' টাকা মাইনের চাকরি করতে পারে না।

চা করার অন্য মানুষ আছে। তবু উমাই চা করতে যায়।

হরিপ্রসন্ন আগে কয়েকবার বলেছে এখন আরও একবার বলে, তুমিই দিলে চাকরিটা, তোমার জন্যই সম্ভব হল।

চন্দ্রনাথ বলে কি জানেন, আপনার মেয়ের জন্য এটুকু না করলে অন্যায় হত। এরকম অসাধারণ মেয়ে আমি আর দেখিনি মাস্টারমশায়। আমার মেয়েও এম-এ পড়েছে—তার সখের লেখাপড়া। এমন রূপ আপনার মেয়ের, টাকার জন্য কি ঠেকত? —ভাল ছেলের কাছেই দিতে পারতেন। এরকম মেয়ে যদি বা কষ্ট করে পড়াশোনা করে, নিজে শিক্ষিতা হবার জন্যই করে। স্বাধীনভাবে চাকরি করে ফ্যামিলিকে সুখে রাখার জন্য উমার মত মেয়ে এত খেটে পরীক্ষা পাস করে না।

হরিপ্রসন্ন বলে, কর্তব্য করার দিকে ওর বাচ্চা বয়েস থেকে ঝোঁক। ঠিক ছেলেদের মত তেজী। কিন্তু মুশকিল কি জানো, ওর কতগুলি মেয়েলী ঝঞ্ঝাট আছে।

চন্দ্রনাথ একটু হেসে বলে, আমি ওকে বলেছিলাম, তোমার মাথা আছে, আরও পড় না? উমা বললে, মাথা না ছাই, শুধু পরীক্ষা পাসের মাথা। খেটেখুটে মন দিয়ে চেষ্টা করলে সব মেয়েই এরকম পাস করতে পারে। মুখস্থ বিদ্যা বাড়িয়ে আর কি লাভ হবে? এরকম সহজ বাস্তব বুদ্ধি আমি আর কারো দেখিনি।

শুধু বিদ্যালাভের জন্য পড়ে লাভ নেই, ভালভাবে বাঁচার জন্যই বিদ্যার দরকার। এই সোজা কথাটা বুঝতে পারার মধ্যে বিশেষ বাস্তব বুদ্ধির কি পরিচয় আছে এবং কি হিসাবে সেটা তার অসাধারণ গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রনাথের কাছে, হরিপ্রসন্ন বুঝতে পাবে না।

পয়সা আছে, বিদ্যা আছে, রাজনীতিও করে থাকে—এসব মানুষের বিচার বিবেচনার ধরণটাই আলাদা!

হরিপ্রসন্ন বলে, এইটুকু বয়েস থেকে বলত, আমি কোন দিন বিয়ে করব না। আমরা ভাবতেও পারিনি সেটা এমন ধনুর্ভাঙ্গা পণ হয়ে দাঁড়াবে। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছে—মেয়েটি ছাড়া আর কিছুই চায় না। আমারা কত চেষ্টা করেছি, কত চাপ দিয়েছি—কিছুতেই মেয়ের মত করাতে পারিনি। তা' মেয়েই আমার ছেলের বাড়া হল তোমার কল্যাণে।

ঃ ও অনেক উন্নতি করবে।

উমা চা এনে দেয়। বাইরের বেশ বদলে সাধারণ শাড়িখানা পরায় আরও যেন সুন্দরী মনে হয় তাকে, খোলতাই হয়েছে রূপ।

চন্দ্রনাথ হঠাৎ প্রশ্ন করে, রাত জেগে পড়তে?

উমার মুখের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকায় এতদিন পরে হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন করার মানেটা বোঝা যায় সহজেই। কথায় বলে রূপলাবণ্য—লাবণ্য ছাড়া রূপ হয়

না। পরীক্ষা পাস করতে ছেলেমেয়েদের মুখে যে শ্রান্তিভরা রুক্ষতার ছাপ পড়ে, উমার মুখে তার অভাবটা নজরে পড়েছে চন্দ্রনাথের।

উমা হেসে বলে, নাঃ। সংসারের কাজ করতাম না তো কখনো, শুধু পড়তাম। বকে বকে মা শেষে হাল ছেড়েছিল। সবাই নিন্দা করত, নিজের লজ্জা হত--কিন্তু কি করব? সব দিক বজায় রাখতে গেলে তো চলে না!

চন্দ্রনাথ খুশি হয়ে বলে, এই সোজা কথাটা যে খেয়াল থাকে না কত মানুষের!

চন্দ্রনাথ উঠি উঠি করছে, সমর খবর দেয়, তোমার সঙ্গে একজন কথা কইতে চাইছে দিদি। বললে চেনা নেই, বিশেষ দরকারে এসেছে।

স্যুট পরা দীর্ঘকায় সুদর্শন যুবক সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিল। উমা সামনে যেতেই বলে, নমস্কার! কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। আমার নাম অনিল সেন, আমিও পোস্টটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম।

উমা বলে, ও!

অনিল একটু হেসে বলে, ভড়কে যাবেন না, আপনাকে বিব্রত করতে আসিনি। এত ক্যাণ্ডিডেট ছিল, আপনি কাজটা পেয়ে গেলেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছা হল। অবশ্য আপনি যদি

উমা বলে, আলাপ করবেন সেজন্য কি? ঘরে আসুন।

ঘরে ঢুকে চন্দ্রনাথকে দেখে অনিল প্রথমে বেশ একটু ভড়কে গেছে বোঝা যায়। কিন্তু পরক্ষণে তার মুখে হাসি ফোটে, বিশেষ মানে-যুক্ত হাল্‌কা কিন্তু ফলাও এক বিশেষ ধরনের হাসি।

চন্দ্রনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীর মুখে বলে, কি ব্যাপার অনিল? তুমি এখানে কেন?

অনিল বলে, ব্যাপার কিছুই নয়। বড় ডিগ্রী থেকে আমি বাতিল হয়ে গেলাম, এদিকে কে একজন উমা দেবী চাকরিটা পেয়ে গেলেন, তাই একটু কৌতূহল হল, আলাপ করতে এলাম।

ঃ বড় ডিগ্রী থাকলেই হয় না।

ঃ তাই তো দেখছি।

অনিল আবার তার মানে-যুক্ত হাসিটা হাসে।

চন্দ্রনাথ আরও গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি অন্যায় বলছ অনিল। আমি কি তোমায় কথা দিয়েছিলাম চাকরিটা কবে দেব? এতটুকু আশা দিয়েছিলাম?

ঃ বাবা আপনাকে বলেছিলেন, আমরা ভেবেছিলাম তাতেই যথেষ্ট হবে।

বোঝা যায় চন্দ্রনাথ রেগেছে।

ঃ বললে তুমি রাগ করবে। তোমার বাবার আশা করার কসুর নেই। আমি কত আশা মেটাব? তোমরা আশা করেছ বলে আমায় দায়ী করা কি উচিত? প্রমোদকে আমি কথা দিইনি। আমি কোনদিন নিজের কথার খেলাপ করিনি। যা বলেছি করে এসেছি। তোমার বেলা কথা যদি দিতাম--

ঃ বলে দিলেই হত পারবেন না। সব ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। আপনি না বলেন নি, বাড়িতে সবাই ধরে নিয়েছে তাহলে আর ভাবনা কিসের ? বাড়ি গিয়ে সকলের হাঁড়িমুখ দেখব, বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, মা কেঁদে কেটে অনর্থ করবে—

অনিল হঠাৎ কথা থামিয়ে সুর পালটে বলে, যাক গে, যাক। এতে আর কি আসবে যাবে। একটা কিছু জুটে যাবে নিশ্চয় !

চাকরিটা পাবে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু পায়নি। পায়নি বলেই যে পেয়েছে তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে আসাটা বড়ই খাপছাড়া ঠেকছিল উমার। অনিল যাই বলুক, ভদ্রঘরের একজন শিক্ষিত ছেলে—কথায় ব্যবহারে দু-এক মিনিটের মধ্যে টের পাওয়া গিয়েছিল যে ছেলেটি কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্নও বটে—এ রকম নাটকীয় কাজ করে বসবে, এটা বরদাস্ত হচ্ছিল না উমার। এবার সে বুঝতে পারে ব্যাপারটা।

নিজের জন্য নয়।

চাকরিটা না পাওয়ায় বিব্রত হলেও এবং হতাশা জাগলেও সেটা তাকে এভাবে তার বাড়িতে টেনে আনত না। সুনিশ্চিত চাকরিটা সে পায়নি জেনে বাড়ির লোকে কি কাণ্ড শুরু করবে এই কল্পনা তার কাণ্ডজ্ঞান টলিয়ে দিয়েছে।

সকলের হাঁড়িমুখ ! মা'র কান্নাকাটি !

তার মানে উমা জানে।

আহা বেচারা !

কিন্তু বেশীক্ষণ বেচারা ভাববার সুযোগ অনিল তাকে দেয় না।

চন্দ্রনাথ কিন্তু তার কথাটা অন্যভাবে নিয়ে আরও চটে যায়। বলে, তোমার বাবা বার বার ভিক্ষুকের মত আসবে—

অনিল পাংশু মুখে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমিও তাই বলছি। বাবাকে ভিক্ষুকের মতই তাড়িয়ে দিলেন না কেন ? কিছুই বলার থাকত না।

ঃ কিছু জানো না বোঝ না, তোমার ওই এক কথা ! সাফ জবাব দিলেন না কেন, তখন বলে দিলেই হত ! বলেছিলাম কি বলিনি তুমি জানো ? প্রমোদ কিভাবে চিরকাল আশা করেছে আর আমার ঘাড় ভেঙেছে খবর রাখো ? অপমান করলেও প্রমোদ গায়ে মাখে না, বার বার আসে। আমারই শেষ পর্যন্ত দয়া হয়—মানে, যতই হোক ছেলেবেলার বন্ধু তো, মায়া না করে পারি না। বাড়ি গিয়ে প্রমোদকেই জিজ্ঞাসা করো, আমি স্পষ্ট বলেছিলাম কি না, এ চাকরিটা তোমায় দিতে পারবো না। তবু যদি সে আশা করে থাকে, সেটা কি আমার দোষ ?

অনিলের পাংশু মুখ ক্রমে ক্রমে লাল হয়ে উঠছে দেখে উমা বড়ই অস্বস্তি বোধ করে। অনিলকে সে স্মরণ করিয়ে দেয়. আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন আমায় বিব্রত করবেন না !

অনিল মাথা হেঁট করে খানিকক্ষণ ভেবে বলে, আপনাকে কিছু বলিনি। আমি চলে যাচ্ছি, নমস্কার।

অনিল চলে যাচ্ছে, চন্দ্রনাথ ডেকে বলে, একটা কথা শোন।

মনে হয় ক্রুদ্ধ চন্দ্রনাথ যেন হঠাৎ জুড়িয়ে গেছে।

অনিল ঘুরে দাঁড়ায়। কাছে আসে না।

চন্দ্রনাথ রীতিমত স্নেহের সুরেই বলে, প্রমোদকে না পাঠিয়ে তুমি একবার নিজে এলে না কেন বাবা? আমার কত কাজ, কত দায়িত্ব, তোমার বিষয়টা ঠিক খেয়াল ছিল না। তুমি নিজের চেষ্টায় উন্নতি করেছ, তোমার কথাই আলাদা। তুমি একবারটি এলেই তো আমার এটা মনে পড়ত। এটা দিতে পারতাম না, অন্য কিছু জুটিয়ে দিতাম। আর কি চাকরি নেই দেশে? যাক গে, দুঃখ করো না, মাঝে মাঝে বাড়ীতে এসো। তোমার মত ছেলের চাকরির ভাবনা? আমি কথা দিচ্ছি, ছ'মাসের মধ্যে এর চেয়ে ভাল চাকরি আমি করে দেব।

কিছুদিন আগে হলে উমা তাজ্জব বনে যেত, কিন্তু চন্দ্রনাথকে সে চিনেছে। চাকরিটা পেয়ে আরও ভাল করে চিনেছে।

মানুষটার মন সত্যই দরাজ! সত্যই তার দরদ আছে আত্মবিশ্বাসী অধ্যবসায়ী মানুষের জন্য, নারীপুরুষ ও বয়স নির্বিশেষে। কারো জন্য কম আর কারো জন্য বেশী হতে পারে মমতাটা, ব্যক্তি বিশেষ ও ক্ষেত্র বিশেষে একটু ভেজাল থাকতেও পারে, কিন্তু জিনিসটা যে খাঁটী তাতে সন্দেহ নেই।

শুধু তার জন্যই চন্দ্রনাথ চাকরির ব্যবস্থা করেনি। আরও অনেক রকম ব্যবস্থা সে করে দিয়েছে।

চন্দ্রনাথের মুখে যেটুকু শুনেছে তাতেই প্রমোদের ব্যাপারটাও সে বুঝতে পারে। ছেলেবেলার বন্ধু বলেই নয়, বার বার সে যে প্রমোদের প্রার্থনা পূরণ করেছে তার কারণ বন্ধুর কাছে অপমানিত হয়েও বার বার সে প্রার্থনা জানাতে গিয়েছে বলে।

প্রমোদের এই ভিখারী-সুলভ অধ্যবসায় চন্দ্রনাথকে কাবু করেছে।

উদারমন মাত্রেরই হয়তো এই দুর্বলতা থাকে! এটা হয়তো উদারতা দেখাবার ক্ষমতা থাকারই একটা অঙ্গ। অধ্যবসায়ের জাতগুণের বিচার নেই চন্দ্রনাথের কাছে। কে শুধু বাঁচার জন্য, ওঠবার জন্য প্রাণপণ করছে আর কার লড়াই কেবল খানিকটা আরাম বিলাসের জন্য, তাদের পার্থক্য সে বোঝে না এমন নয়। কিন্তু প্রাণপাত করাটাই শেষ পর্যন্ত তার কাছে দাঁড়িয়ে যায় আসল হিসাবে।

অনিল চুপ করে দাঁড়িয়েই আছে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে। চলেও যায় না, কিছু বলেও না। এটা বুঝতেও অবশ্য কারো এতটুকু কষ্ট হয় না যে নিজেকে সে সংযত করার চেষ্টা করেছে প্রাণপনে। উমা রীতিমত শঙ্কা বোধ করে।

রাগ হবার কথাই অনিলের। প্রমোদ ছেলেবেলার বন্ধু হতে পারে চন্দ্রনাথের। মুখের ওপর ভিখারী বলে তাকে যত খুশি অপমান সে করতে পারে, সেটা তাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার। একেবারে অমানুষ না হলে ছেলে কি নিজের বাপের নামে অন্যের মুখে যা তা শুনে রাগ না করে পারে?

তবু সে চুপ করে চলে যাচ্ছিল। উমাকে কোন রকমে বিব্রত করবে না কথা দিয়েছে।

কিন্তু সেই বাপকে বাতিল করে ডিঙিয়ে গিয়ে হঠাৎ তাকে দরদ দেখানোটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত লেগেছে অনিলের।

তবে দরদটা ফাঁকা কথা নয়। কয়েকমাসের মধ্যে চন্দ্রনাথ তাকে ভাল চাকরি জুটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাগটা অনিল সামলে যেতেও পারে।

উমা তাকে ধাতস্থ করার আশাতেই সহজভাবে বলে, একটু বসুন না? আলাপ যখন হল

চন্দ্রনাথও খুশি হয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, বসেই যাও একটু। আমার কাছে আত্মীয়-বন্ধু বড় নয়, মানুষ হওয়া চাই। প্রাণের কথাই বলছি, প্রমোদ বিরক্ত করে কিন্তু তুমি এলে আমি খুব খুশিই হব।

তার সস্নেহ আমন্ত্রণের জবাবে অনিল বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, আপনি কি নেশা করেন? মদ না গাঁজা?

বলে কোনদিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে চলে যায়।

হরিপ্রসন্ন ওঘরে গিয়েছিল অনিলের জন্য একটু খাবার আনাবার ব্যবস্থা করতে। বাড়িতে মানুষ এলে মিষ্টি মুখ করানোর পাট আজকাল একরকম উঠে গেছে। নিয়মটা যেন সর্বসম্মতিক্রমেই বাতিল হয়ে গেছে। সাধ্যে না কুলোলে উপায় কি!

তবে অনিলের জন্য সামান্য মিষ্টিই আনবে ভেবেছিল হরিপ্রসন্ন।

ঘর থেকে অনিলকে বেরিয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা গায়ে চাপিয়ে সে অনিলের নাগাল ধরতে ছোটে।

ছাপান্ন বছর বয়স। অম্বল আর বাতের রোগী। অনিল মোটে মিনিট খানেকের পথ এগিয়ে গিয়ে থাকলেও নাগাল ধরতে তার হাঁপ ধরে যায়। ল্যাম্পপোস্টটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কি হল বাবা? চলে যাচ্ছ কেন? অ্যাদ্দিন বাদে যদি বা বাড়িতে পা দিলে—

অনিল চমৎকৃত হয়ে বলে, আপনি আমায় চেনেন নাকি? আগে এসেছি আপনাদের বাড়িতে!

ঃ বাড়িতে আসনি, তাই বলে চিনব না তোমাকে? প্রমোদের সাথে আমার কত কালের পরিচয়!

অনিল আশ্চর্য হয় না। কলকাতায় কত মানুষের মধ্যেই যে এরকম পরিচয় আছে। অফিসে মাঠে পথে ঘাটে সারাজীবন ধরে দেখা হয়েছে প্রতিদিন অথচ একে অপরের বাড়ি চেনে না, পরিবারকে জানে না। যত দীর্ঘ সময় ধরেই ঘটে চলুক, বাইরের জগতের জানা-শোনাটুকুও নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে এগোয় না।

ঃ আপনি বাবার অফিসে কাজ করতেন?

ঃ না। অন্য সূত্রে পরিচয়।

প্রমোদের রেস খেলার বাতিক আছে। হয়তো ঘোড় দৌড়ের মাঠেই দু'জনের পরিচয়।

হরিপ্রসন্ন অনিলকে ফিরে গিয়ে একটু বসতে অনুরোধ জানায়, উমার চেয়ে ঢের বেশী আন্তরিকতার সঙ্গে আর অমায়িকভাবে। বলে, তোমার জন্য খাবার আনতে দিয়েছি, একটু বসে না গেলে মনে কষ্ট পাব বাবা।

অনিল বলে, আজ আমায় মাপ করুন। আজ বিশেষ অসুবিধা আছে, আমি আরেক-দিন আসব।

হরিপ্রসন্ন সত্যই ক্ষুণ্ণ হয়।

ঃ অসুবিধা থাকলে অবশ্য

ঃ আমি শিগ্‌গির একদিন আসব।

হরিপ্রসন্ন যেন বেশ একটু বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। চলার জন্য পা বাড়িয়েও অনিলকে তাই দাঁড়াতে হয়। বিরক্তির তার সীমা থাকে না একেবারেই।

হরিপ্রসন্ন আমতা আমতা করে বলে, তোমাদের বাড়ির ঠিকানা ভুলে গেছি

শুনে বিরক্তি কেটে গিয়ে অনিলের কৌতুক বোধ হয়। পকেট থেকে একখানা কার্ড বার করে সে হরিপ্রসন্নের হাতে দেয়। প্রমোদ যেদিন বাড়ি ফিরে জানিয়েছিল যে চন্দ্রনাথকে সে বলে এসেছে, চাকরিটা অনিলের হয়ে যাবে, তার পরদিন সে অন্য জরুরী প্রয়োজন তুচ্ছ করে নিজের নামে কার্ড ছাপিয়ে নেবার জন্য পয়সা খরচ করেছিল।

খানিক হেঁটে ট্রাম-বাসের বড় রাস্তায় পড়ে অনিল নিজে থেকেই আবার দাঁড়ায়। এখনি বাড়ি ফিরবে? না নিরিবিলি কোথাও বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে?

অপমান আর রাগের জ্বালা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ঝিমিয়ে গিয়েছে। একটু একটু আপসোস জাগছে এখন। বাপের অপমান? মিছে কথা। এখন আর নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কি! প্রমোদ যে চন্দ্রনাথের কাছে ভিখারীর মত হাত পাততে যায় এবং চন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে নানারকম ভিক্ষা পায় বলেই সে যে সামান্য আয়েও বেশ স্টাইলে সংসার চালায়, ছেলেকে বিলাত পর্যন্ত পাঠায়, এ খবর তো জগতশুদ্ধ সবাই জানে!

বছর তিন আগের ঘটনাটি সে তো ভুলে যায়নি।

হঠাৎ একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে সকলের সামনে রেস খেলার জন্য প্রমোদকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে চারশো টাকার নোট তার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল চন্দ্রনাথ।

বলেছিল, কাল তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তবু নিজেই এলাম কেন জানো? তুমি বন্ধুত্ব ভুলে ভিখিরী বনেছ, আমি চোরাবাজারী বনতে পারিনি। কিন্তু এইবার শেষ প্রমোদ, তুমি আর যেও না আমার কাছে।

অনিলও হাজির ছিল বৈ কি। সে দৃশ্য আর চন্দ্রনাথের কথাগুলি স্মৃতিপটে তার খোদাই হয়ে আছে, এ জীবনে মুছবার নয়!

সে তুলনায় চন্দ্রনাথ তো আজ প্রায় শুধু একটু অনুযোগ জানিয়েছে বন্ধুরূপী ঘাড়-ভাঙ্গা তার বাপটির সম্পর্কে।

তাতেই তার মেজাজ এমন বিগড়ে গেল ? সস্নেহে তাকে তার গুণের দাম পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও ?

তাই কখনো যায় !

পাগল হতে না বসলে মেজাজ কারো এমন আবোল তাবোল চড়ে নামে না।

তিন

বানিয়ে বানিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কি যে সব আবোল তাবোল কথা লেখা হয় উপন্যাসে! না আছে খাপছাড়া উদ্ভট মানুষগুলোর কথা আর কাজের সঙ্গতি, না আছে ঘটনাগুলির কোন সামঞ্জস্য।

কয়েক পাতা পড়তে পড়তেই হাই ওঠে উমার।

সেই পাতাটি কোণ মুড়ে বই বন্ধ করে রেখে পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

একথাও অবশ্য ঠিক যে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হবার সময় ছাড়া সে কখনো উপন্যাস পড়তে চেষ্টা করে না। তার সময় কই ?

পরীক্ষায় পজিসন পেতে হলে যে বইগুলি পড়তেই হবে, শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য নির্দিষ্ট সেই বইগুলি ভাল করে পড়ার জন্য যথেষ্ট সময় মেলে না, স্কুলেও মেলে না, কলেজেও মেলে না,—পড়ার বই পড়ে নিয়ে ঘুমোতে যাবার আগে ছাড়া উপন্যাস পড়বার সত্যই তার সময় কই ?

পরীক্ষার আগে ঘুম ঠেকিয়ে পড়ার বই অবশ্য পড়তে হয়—না পড়ে উপায় কি ? ঘুম ঠেকিয়ে জোর করে উপন্যাস পড়ার কোন মানে সে খুঁজে পায় না।

কি লাভ এইসব সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট বানানো মানুষের আজগুবী কাহিনী পড়ে ? পড়ার কষ্টটাই সার। কিছুই শেখা যায় না, জানা যায় না। আসল ব্যাপারটা তো সেই একটা ছেলে আর একটা মেয়ের ভালবাসা কিংবা একটা চোর অথবা খুনীর সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত একজন ডিটেকটিভের জিতে যাওয়া।

তবে অনেকে উপন্যাস পড়ে, তাই ঘুমোতে যাবার আগে যা হাতের কাছে পায় পড়ে দেখবার চেষ্টা করে উমা। যেটুকু পড়ে তাই তার নিজের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়।

দু'চারখানা উপন্যাস পড়তে শুরু করে অবশ্য আর ছাড়তে পারেনি—পরীক্ষার পড়ার মতই রাত জেগে শেষ করেছে। শেষ করেও ঘুমোতে পারেনি বহুক্ষণ। মনে যেন এসেছে কেমন অদ্ভুত চিন্তার আলোড়ন, হৃদয়ে যেন জোয়ার এসেছে আবেগ অনুভূতির বিচিত্র সমারোহে।

যাই হোক, মোট কথা, উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে না উমার। তেইশ বছর বয়স হল আর যে কোনদিন ভাল লাগবে সে ভরসা নেই !

আজ কিন্তু নিজেকে উপন্যাসের নায়িকার মতই মনে হয় উমার !

উপন্যাসের নায়িকা যেমন লাখপতি, কেরাণী, মজুর বা চাষীর মেয়ে হয়েও উপন্যাসে হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নারী—নিজেকে তেমনি মনে হয়।

সে স্টার্ট পেয়েছে আড়াইশো টাকার চাকরিতে। তাদের বংশের কেউ কখনো আড়াইশো টাকার বেশি মাইনেব চাকরি করেনি—তাদের বংশের পুরুষেরা।

এমন একজনও আত্মীয় নেই উমার যে দু'শোর ওপরে বেতন পায়।

তাদের বংশে তার আগে অবশ্য কোন মেয়ে চাকরি করেনি। সে-ই প্রথম।

বংশের সব পুরুষকে টেক্কা দিয়ে সে বেশী মাইনের চাকরি বাগিয়েছি। অজিতের জন্যই অবশ্য সম্ভব হয়েছে এটা। কিন্তু তার মত মেয়ে না পেলে চন্দ্রনাথ কি এ কাজটা তাকে দিতে পারত? প্রভাবওয়ালা মানুষের চেষ্টাতেই চিরকাল চাকরি হয়ে এসেছে মানুষের পুরুষ এবং নারী দুয়েরই। এটা নতুন ব্যাপার কিছুই নয়। ডিগ্রি ইত্যাদির মত অজিত চন্দ্রনাথেরাও চাকরির একটি অনিবার্য আনুষঙ্গিক মাত্র। সকলের বেলাতেই এই নিয়ম। অজিতের মত কেউ ধরলে এবং চন্দ্রনাথের মত একজন জুটিয়ে দিলে তবেই মানুষের চাকরি জোটে।

অনিল চলে যাবার পরেও চন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে খনিকক্ষণ বসে।

প্রৌঢ় বয়সেই বুড়ো না দেখাবার জন্য চন্দ্রনাথ অতি সম্প্রতি ধুতি চাদর ছেড়ে স্বদেশী-মার্কা স্যুট ধরেছে। বেশ-ভূষায় বাড়াবাড়ি বা চাকচিক্যের ছেলেমানুষি চন্দ্রনাথের ধাতে নেই। বেশ-ভূষার সহজ সাধারণ মূল নিয়মটাই সে মেনে চলে। ধুতি পরলে বিধবাদের বয়স কম দেখায় কিন্তু তাকে শুধু বুড়ো নয়, একেবারে গেঁয়ো দেখায়। সে যা নয় তাই দেখায়। এ অবস্থায় বেশ পরিবর্তন না করা শুচিবাই ছাড়া কিছুই নয়।

ধুতি-পরা ছেলেকে ফুলপ্যান্ট আর শার্টে হঠাৎ বড় দেখায়, বুড়ো মানুষকে সাহেবী বেশে দেখায় যেন এখনো তার যৌবন একেবারে যায়নি।

মস্ত গাড়ী। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার লোকে চেয়ে দেখছে। মোটা বেতনের ড্রাইভার লোকেশ গাড়ী চালায়। বাজে আর অকর্মণ্য হলেও বাঙালী ড্রাইভার রেখেছে বলে চন্দ্রনাথ সমতুল্যদের বলতে ছাড়ে না যে, তোমরা কথায় আমি কাজে! যদিও লোকেশকে সে বাঙালী বলে রাখেনি—রেখেছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কিন্তু সেটা জেনেও সে জানে না, মেনেও সে মানে না। বাঙ্গালীর সঙ্গে ভারতীয়দের নানারকম নাকি বিরোধ আছে—এই সাময়িক লৌকিক এবং কাল্পনিক কুসংস্কারের সঙ্গে সে যেন রীতিমত লড়াই করছে—লোকেশকে ড্রাইভার রাখার এই কারণটাই সে ঘোষণা করে।

অজিত প্রায় তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন আসে।

অফিস ছুটি হবার ঘণ্টাখানেক আগে।

চন্দ্রনাথের কামরায় মিনিট দশেক কাটিয়ে এসে উমার টেবিলের সামনে দাঁড়ায়।

একটু কাতর মুখে—উৎসুক মুখে!

কে জানে ছলনা কিনা!

ঃ এখুনি ছুটি হয়ে যাবে। চল না আজ রাতটা আমরা—

ছ-সাতটা ফাইলের স্তূপটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে উমা বলে, ছুটি তো হবে—এই ফাইলগুলো সারতে হবে বাড়িতে।

চোখ প্রায় কপালে তুলে অজিত বলে, বাড়িতেও তোমাকে খাটতে হয়! চন্দরদা কি ইয়ার্কি জুড়েছে আমার সঙ্গে?

ঃ আমার চাকরি করার ব্যাপার নিয়ে তুমি চন্দ্রবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গেলে কাল আমাকে রিজাইন দিতে হবে।

ঃ ও!

অজিত রেগে যায়, চলে যাবার জন্য পা বাড়ায় কিন্তু আবার দাঁড়ায়, চন্দ্রনাথের সম্পর্কে উমাকে সতর্ক করে দেবার জন্য আবার বসে।

উমার সম্পর্কে দায়িত্ব যেন সে ভুলতে পারবে না।

ঃ চন্দ্রনাথের সঙ্গে কিন্তু বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করো না। মানুষটা সুবিধের নয়।

উমা আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে।

ঃ তুমি আমাকে এই উপদেশ দিচ্ছ? কে লোক ভাল নয়, কার সাথে মিশব না? চন্দ্রবাবু আমার বাবার ছাত্র · আমায় স্নেহ করেন। ওর সঙ্গে আমি যেমন খুসি, যত খুশি মিশব।

অজিত নীরবে চলে যায়।

কে জানে চাকরিটা থাকবে কিনা!

অজিত এবার চন্দ্রনাথের ওপর চাপ দেবে কিনা চাকরি থেকে তাকে তাড়াতে!

স্কুলে কলেজে বিদ্যালাভ করেছে, জানাশোনা হয়েছে অনেক মেয়ের সঙ্গে। তারই মধ্যে একজনের তুলনায় আরেকজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও খানিকটা বেশি হয়েছে অনায়াসেই বলা চলে।

সে হিসাবে ঘনিষ্ঠ মেয়ে বন্ধু উমার আছে ধরা যায়। কিন্তু যাকে বলে প্রাণের বন্ধু, হৃদয়মনের সমস্ত আড়াল আবডাল ঘুচিয়ে দিয়ে সহজে স্বাভাবিকভাবে সব সময় মেলা-মেশা যায় যে সখীর সঙ্গে, সে রকম বন্ধু বা সখী একটিও নেই উমার।

ছেলেবেলায় গলায় গলায় ভাব হত এ মেয়েটা ও মেয়েটার সঙ্গে—প্রাণের বন্ধুর যখন কোনই দরকার ছিল না। মন খুলে কি কথা বলবে সখীর সঙ্গে? অল্প বয়সে সবই তো ছিল তখন মন-খোলা কথা।

স্কুল-জীবনে অতটা খেয়াল থাকেনি। কলেজে উঠে মাঝে মাঝে সখীর অভাব বোধ করেছে। এমন সব কথা ও সমস্যার আমদানি ঘটেছে জীবনে নিজে নিজে ভেবে যার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, আবার সখী ছাড়া মুখ ফুটে অন্যের কাছেও বলা যায় না।

দেহ নিয়েই কত প্রশ্ন জাগত, কত ধাঁধায় পড়তে হত, কত রকম ভয়-ভাবনায় বিব্রত হতে হত।

এমন কেউ ছিল না যে, দুটো মুখের কথা বলে তাকে একটু সাহায্য করে।

দেহ সম্পর্কে কত উদ্ভট হাস্যকর ধারণা এই সেদিন পর্যন্তও যে তার বজায় ছিল!

চাকরি আরম্ভ করার পর আজকাল আবার একজন ওরকম বন্ধুর জন্যে চেয়ে প্রাণটা ব্যাকুল হয় উমার।

আগে তবু এক ধরনের ভাব ছিল বাড়ির লোকের সঙ্গে, ঘর-সংসারের বিষয় প্রাণ খুলেই আলোচনা করা যেত সবাই বসে, তর্কাতর্কি রাগারাগি হয়ে গেলেও যেন তিক্ততা সৃষ্টি হত না তেমন কিছু, মনের ভাবটা মোটামুটি খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ করা যেত।

চাকরি করে সংসারের দায়িত্ব নেবার পর বাড়ির লোকেরাও কেমন যেন দূরে সরে গেছে।

সে যে শক্ত হাতে হাল ধরবে সংসারের, এটা পছন্দ করতে পারছে না কেউ—বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সকলেই এজন্য তার উপর কম বেশী বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ।

রোজগার করুক, তারই জন্য হালে আবার পানি লাগুক প্রায় অচল সংসারটার, কিন্তু তবু তো সে মেয়ে! সকলে আশা করেছিল সে মেয়ের মতই নম্র হয়ে, নত হয়ে সর্বদা হাল্কা হাসিখুশি ভাবে ডগমগ হয়ে থাকবে, কোমল আর স্নেহপূর্ণ হবে তার কথা ও ব্যবহার, তাকে দুর্বল কাবু করে রাখবে অন্যের মান অভিমান।

গুরুতর বিষয়ে অবশ্য পরামর্শ নেওয়া হবে তার, কিন্তু এতকাল যারা যে কায়দায় সংসার চালিয়ে এসেছে তারাই আসলে সংসারটা চালাবে, সব বিষয়ে তারাই মাথা ঘামাবে।

হরিপ্রসন্ন থাকতে তার কি দরকার সংসার নিয়ে দুশ্চিন্তা করার, আনাড়ি হাতে সংসারের ছোট বড় দায় যেচে নিয়ে এত হাঙ্গামা করার ?

রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে আছে হরিপ্রসন্ন।

তার ব্যবস্থা বাতিল করে উমা নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে তার সংসারে, কড়াকড়ি করছে নানা দিকে।

পারলে মেয়ে যেন তাকেও শাসন করে।

চিরকালের রীতি অনুসারে কাঁচা বাজার আর তেল-নুনের খরচের টাকাটা মা'র হাতে তুলে দেয়। বাকী সব খরচ রাখে নিজের হাতে।

মস্ত একটা বাঁধানো খাতা কিনেছে জমা-খরচের জন্য।

বলে, হিসেব না রেখে আজকালকার দিনে খরচ-পত্র করা যায় ? কোনটা না হলেই নয়, কোন্‌টা কতটুকু টানা যায়, কোন্‌টা স্রেফ বাজে খরচ হচ্ছে এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব রেখে কোনরকমে যদি সামাল দেওয়া যায়!

শুনে হরিপ্রসন্ন মুখ বাঁকায়। এতকাল তো দিব্যি সে চালিয়ে এসেছে খুঁটিনাটি হিসাবের খাতা ছাড়াই। ধোপার একটা খাতা ছাড়া কোন খাতাই দরকার হয়নি।

সংসার চালাতে চালাতে মানুষের আপনা থেকেই জানা হয়ে যায় কোন্‌টাতে কি রকম খরচ লাগে।

হিসাবের খাতা করুক, টিপে টিপে টাকা খরচ করুক, তাও তবু সহ্য করতে পারে বাড়ির লোকে। হিসাবের খাতাটা করার ফলে আর যাই হোক সকলকে বঞ্চিত করে

সে যে গোপনে টাকা জমায় না নিজের জন্য এটা মানতে হয়েছে সকলকে—মাসের শেষে জমা-খরচের অঙ্কগুলির দিকে চেয়ে এটা না মেনে উপায় থাকে না।

কিন্তু এতকালের চালচলন ভুলে গিয়ে পাল্টে দিয়ে সে যে নতুন নতুন সব সংস্কার আনতে চাইছে সকলের জীবন-যাত্রায়, সেটাই অসহ্য ঠেকছে ছেলে-বুড়োর।

সে যেন যন্ত্র করে দিতে চায় সকলকে, একটা ধরা-বাঁধা গোনা-গাঁথা হিসাবের ওজন করা যান্ত্রিক জীবন-যাপন করাতে চায় সকলকে দিয়ে।

সব সে বেঁধে দিতে চায় নিয়মে।

রান্না-খাওয়ার মধ্যেই তার কত কায়দা আমদানির চেষ্টা!

রুচির প্রশ্ন মুখের স্বাদের প্রশ্ন বাতিল করে সে বড় করতে চায় পুষ্টির প্রশ্নটা। ঘি দুধ মাছ মাংস প্রচুর পরিমাণে খাইয়ে নয়, ব্যবস্থা তার একবেলা একটুকরো মাছ অথবা ডিমের তরকারির খোসা ভাতের ফ্যান ফেলতে না দিয়ে, মুখে না রুচলেও কয়েকটা বিশেষ শাক-সব্জি আর যখন যে সব শাক পাতা সস্তা হয় সেগুলি সকলকে খেতে বাধ্য করে সে পুষ্টির ব্যবস্থা করে।

আগের মত এলোমেলো উল্টোপাল্টা বাজার করা, রান্না করা আর এটা বেশী করে খাব কিন্তু ওটা ছোঁব না নিয়মে যার যার খুশিমত খাওয়া তার আমলে চলবে না। এরকম এলোমেলো উল্টোপাল্টা খাবে তারপর দরকার হবে ডাক্তার ডাকিয়ে শিশিভরা ভিটামিন খাওয়াবার।

তার কোন মানে হয় না!

ভাগ্যে রোজ তাড়াতাড়ি খেয়ে তাকে অফিস যেতে হয়! রোজ সকলের খাওয়ার সময় সে হাজির থাকলে বোধহয় ইতিমধ্যে একদিন মারামারি বেধে যেত!

ছুটির দিন ছাড়া নিজের হাতে সকলকে যন্ত্র বানাবার চেষ্টা করার ক্ষমতা তার নেই। উপদেশ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ছুটির দিনে দারুণ কলহ বেধে যায়। সকলের সঙ্গে একা লড়াই করতে প্রায় দিশে-হারা হয়ে যাবার উপক্রম হয় উমার।

সেদিন শনিবারের বিকালে যেমন বেধেছিল সকলের সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে।

বাড়ি ফিরেই সে টের পায় সকলের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। উঠতে বসতে একটা অস্বাভাবিক উৎসাহ উদ্দীপনার ভাব।

কী ব্যাপার?

না, সকলে সিনেমায় যাবে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে—হরিপ্রসন্নের পর্যন্ত।

উমাকে অবশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে। সে তো সিনেমার উপর হাড়ে চটা।

হরিপ্রসন্ন বলে, আমার বদলে তুই যা বরং। বুড়ো বয়সে কি আবার সিনেমা দেখব!

মা বলে, না না, তুমি যাও। উমা যায় তো আমার টিকিটে যাবে। আমি নয় একটু কালীঘাটে ঘুরে আসব।

উমা শুধু বলে, তোমরা বড় বেশি সিনেমা দেখছ আজকাল!

শুনেই হাঁড়ি হয়ে যায় সকলের মুখ।

উমা চা খেতে খেতে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলে, যাচ্ছ যাও, সেজন্য নয়। হপ্তায় একবারের বেশি সিনেমা দেখা কি আমাদের মত অবস্থায় পোষায়?

মা গম্ভীর মুখে বলে, বসন্ত আমার কাপড়ের জন্য টাকা পাঠিয়েছে, সেই টাকায় যাচ্ছি।

ঃ কাপড় কিনবে কোন্ টাকায়?

ঃ এ মাসে নয় কাপড় কিনব না!

ঃ তুমি সিনেমাও দেখবে, কাপড়ও কিনবে। তোমার ছেলে চাকরি করে, মেয়ে চাকরি করে, তোমার ভাবনা কিসের?

অফিসে চন্দ্রনাথও আজকাল ভালভাবে কথা কয় না, সম্মান রেখে ব্যবহার করে না। গায়ের জ্বালাতেই বোধহয় অতিরিক্ত কাজের চাপ চাপিয়ে দিয়েছে উমার উপর!

বড়ই শ্রান্ত আর বিরক্ত বোধ করছিল উমা। নইলে হয়তো এভাবে খোঁচা দিয়ে দিয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলত না।

সকলে সিনেমায় চলে যাওয়ার পর খালি বাড়িতে একা একা তার দম যেন আটকে আসে।

নতুন পাড়ার ভাড়াটে বাড়ি। অফিস আর সংসার না থাকলে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গেও হয়তো ভাব করার সময় জুটত।

কেবল বাড়িতে নয়, পাড়াতেও নিজেকে তার একা মনে হয়।

পাড়াতে না হলেও কাছাকাছি বাস করত তার কলেজ জীবনের একটি বান্ধবী, সবিতা।

দু'বছর আগেও কলেজে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ট্রামে বাসে বাড়ির দিকে ফিরেছেও তারা দু'জনে একসঙ্গে।

লেখাপড়া সংক্রান্ত কি একটা ব্যাপারে একদিন মাত্র সে সবিতাদের বাড়ি গিয়েছিল কয়েক মিনিটের জন্য। বাড়িটা কি চিনতে পারবে না আজ?

বেশ বদল না করেই, চুলে চিরুণীর আঁচড় না দিয়েই শুধু লপেটাটা পায়ে লটকে প্রকাণ্ড তালাটা সদর দরজায় এঁটে উমা বেরিয়ে পড়ে।

সবিতাদের বাড়ি খুঁজে নিতে হয় না। পথটা যেন আঁকা হয়েছিল মনের মধ্যে। কতবার যেন আসা-যাওয়া করেছে।

প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি হলেও তার ধাঁধা লাগে না। দোতলার কোন্ দিকের ফ্ল্যাটটায় সবিতারা থাকে তার স্পষ্ট মনে আছে।

কড়া নাড়তে সাত আট বছরের একটি ছেলে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করে, কাকে চান?

ছেলেটির মুখ যেন সবিতার মুখের ছাঁচে ঢালা।

ঃ তোমার দিদিকে চাই।

ঃ দিদি? আমার তো দিদি নেই।

ঃ তোমার যে দিদি কলেজে পড়ত ? সে কোথাও চলে গেছে নাকি ?

ছেলেটি একটু বিরক্ত হয়ে বলে, বলছি আমার দিদি নেই, আমি সবার বড়, আপনি খালি দিদি দিদি করছেন। আমার মা কলেজে পড়ত, দিদি নয়।

শুনে উমা চমৎকৃত হয়ে গিয়ে বলে, আচ্ছা, তোমার মাকেই একটু ডাকো দিকি ?

একমিনিট বাদে সবিতা এসে বলে, আরে, উমা যে ! কি ব্যাপার ? আয় আয় ভেতরে আয়, খবর সব বল্ দিকি শুনি। তুই নাকি মস্ত চাকরি করছিস্ শুনলাম ?

উমা ভেতরে গিয়ে ছোট বসবার ঘরটিতে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বলে, বলছি, বলছি, সব বলছি। তুই আগে আমাকে একটা কথা বল্। এটা কার বাড়ি ?

—কার বাড়ি মানে ? বাড়িওয়ালার বাড়ি। আমরা এই ফ্ল্যাটে ভাড়া আছি এগার বছর।

ঃ এগার বছর ? স্বামীর ঘর নাকি ?

ঃ হ্যাঁ। তুই তো একবার এসে দেখে গিয়েছিলি ?

উমা ব'সে বলে, এসেছিলাম কিন্তু কিছুই দেখিনি। আমি জানতাম তুই কুমারী, মেয়ে, এটা তোর বাবার বাড়ি, বাপের পয়সায় কলেজে পড়ছিস্। আমি সত্যি জানতাম না তোর বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরেও তুই কলেজে পড়ছিস। বিয়ে দেবার জন্যেই লোকে মেয়েদের পড়ায় কিনা, আমি তাই ধারণাও করতে পারিনি তুই বিয়ের পরেও পড়ছিস্।

সবিতা বলে, কপালে তখন সিঁদুর দিতাম না—উনিই বারণ করতেন, বলতেন, তা হবে না, কলেজের খরচ যদ্দিন দেব, তোমায় কলেজের মেয়ে সেজে থাকতে হবে। একটা ছেলে একটা মেয়ে হয়েছে, তখন তোর সাথে আলাপ। টের পাসনি ?

উমা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, টের পেতে চাইলে নিশ্চয় টের পেতাম ! কে কার দিকে তাকায় ! গরীবের মেয়ে, তোর শাড়ি ব্লাউজ দেখে বুক জ্বলে যেত। ভাবতাম তোর বাপে আমার বাপে কত তফাত ! স্বামীর কাছে শাড়ী ব্লাউজ পাস্, এটা জানলে অন্তত নিজের বাপের ওপর মনটা অত বিগড়ে যেত না।

ছ-সাত বছরের একটা ফ্রক পরা মেয়ে বলে, চা খাবেন মাসীমা ? আমি চা করতে পারি।

উমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাতের জবাবে সবিতা বলে ইনি মেজো মেয়ে। আরেকটি আছে, তিন বছরের।

ঃ কলেজে পড়বার সময় মোট দুটি ছিল।

ঃ দুটি কম হল বুঝি ? তোমার তো একটিও ছিল না।

ঃ চা দেব মাসীমা ?

বাণী আবার জিজ্ঞাসা করে।

উমা বলে, চা খাব বৈকি ! খিদে পেয়েছে কিনা, খাবার খেয়ে তারপর চা খাব

কিছু খাবার আনাব ?

—আমিই আনতে পারি

সবিতা উমার হাত চেপে ধরে। বলে সামান্য কিছু আনতে দাও, বড় চাকরি কর, তোমার অনেক টাকা, এটা টের পেতে দিও না।

উমা বলে, তুমি পাগল হয়েছ? আমি বড়লোকপনা করতে এসেছি? একটা আস্ত টাকাও সে বার করে না। যেন অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় সাড়ে এগার আনা পয়সা বার করে বাণীকে খাবার আনতে দেয়।

জিজ্ঞাসা করে, কর্তা?

সবিতা বলে, কর্তা রান্নাঘর সামলাচ্ছে। আই-এ ফেল তো, আর আমায় এম-এ পাশ করিয়ে বড় ভয় করে। বলে কি জানো? রান্না নিয়ে তোমাকে আটকে থাকতে হবে না। বন্ধুরা এলে, গিয়ে সমান ভাবে মিশবে—রান্নাঘর আমি সামলাবো।

ঃ কিছু করছিস?

ঃ তোর মত ভাগ্য কি সকলের হয়? একটা স্কুলে মেয়ে পড়িয়ে কিছু পাই।

চার

পাঁচীর মা যথারীতি মরে। যথারীতি তাকে পোড়ানো হয়।

ঠিক দু'মাস পরে শোনা যায়, সাত দিন পরে পাঁচী আর কার্তিকের বিয়ে হবে।

পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে বকুল পাঁচীকে ডেকে পাঠায়।

ঠিক দুপুর বেলা। বাবা আর দাদা যখন অফিসে, ভাইবোনেরা স্কুলে, মা আর মাসীপিসীরা ঘুমে।

সত্যিকারের বাইরের ঘর বলে কিছু নেই—রাত্রে দু'জন শোয়, সকালে বিকালে ছেলেমেয়েরা পড়ে।

তবে দুপুরে কয়েক ঘন্টা খালি থাকে ঘরটা।

বকুল বলে, হ্যাঁরে পাঁচী, দুটো মাস দেরি করতে পারলি না? এমন তাড়া তোদের?

পাঁচী মুখ বাঁকিয়ে বলে, মোদের তাড়া কি গো? মোকে তাড়িয়ে দিতে পারলে বাড়ির লোকে যে বাঁচে! ওরাই তো গরজ করে দিচ্ছে।

ঃ যাক গে। কার্তিক তবে খেলা করেনি? সত্যি সত্যি তোকে ভালবাসে!

পাঁচী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ, মানুষটার দরদ আছে, তোমরা যেমন ভেবেছিলে ঠিক তেমন নয়।

ঃ লোকে কত কি যে বলেছে তোদের নামে!

ঃ লোকের দোষ কি বল দিদিমণি? মিছে তো আর নয়। বিয়ে হয়নি, বাড়াবাড়ি চলছে—লোকে বলবে না?

ঃ তোর খুব খারাপ লাগত না?

ঃ মোর কি ভয়ে কম বুক কেঁপেছে দিদিমণি? মা'টা মর মর, চিকিচ্ছে চালাচ্ছে,

কি করি বল, উপায় কি। মা'র সেবার ছুতো করে দিন পোহাচ্ছে, শেষকালে যদি পালায়? কত রাত না ঘুমিয়ে ছটফট করেছি।

পাঁচী স্বস্তির হাসি হাসে।

ঃ নাঃ, মানুষটা তেমন নয়। মনে প্রাণে জানতাম ঠিক, নইলে কি আর—?

বকুল বলে, কি কাণ্ড তোদের, মাগো! ছি ছি!

পাঁচী বলে, ছি ছি কি গো দিদিমণি? মেয়েছেলে—মোদের কত কি সইতে হয়, মানতে হয়। মা'র নইলে চিকিচ্ছে হত এক বচ্ছর? রোগ ধরতেই পটল তুলত সাত-দিনে।

ঃ এক বচ্ছর বাঁচিয়ে কি হল?

ঃ ওমা! রোগ হলে বাঁচাবার চেষ্টা হবে না? গোড়ায় আশা ছিল না সেরে যাবে। দু-তিনবার ভাল হয়ে উঠেছিল, ফের বিগড়ে গেল তো করা কি। এসব রোগের তেমন চিকিচ্ছে কি আর মোদের দিয়ে হয়? দামী দামী ওষুধ চাই, ভাল ভাল পথ্য চাই—

বকুল খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

ঃ তা, ভালবাসা আছে বলছিস—খাঁটি দরদ। কেলেঙ্কারি না করে তোর মা'র চিকেচ্ছেটা চালাতে পারত না? এ কেমন ধারা দরদ!

পাঁচী বলে, মোরা যে মুখ্যু গরীব ছোটলোক মানুষ গো দিদিমণি। তোমাদের ছাঁকা দরদের পিরিত কি মোদের পেটে সয়?

পাঁচীকে বিদায় দেবার পর বকুলের মনে হয়, মাথাটা তার ঘুরছে।

জীবনে এই যেন প্রথম!

সত্যসত্যই মাথা ঘুরছে। কান্তা এসে কথায় কথায় কত অদ্ভুত কথা বলে, শুনতে শুনতে মনে হয় তার মাথা ঘুরছে।

কিন্তু আজ পাঁচীর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে সে টের পাচ্ছে সত্যিকারের মাথা ঘোরা কাকে বলে!

কার্তিকের সঙ্গে পাঁচীর বিয়ে! তাদের কেউ নেমতন্ন করেনি।

ওদের বিয়ের উৎসবে তারা কেউ যাবার কথা কল্পনাও করেনি।

কান্তা এসে গোল বাধায়।

বলে, তাই কখনো হয়? আমাদের নেমন্তন্ন করেনি বলে, মণ্ডা মিঠাই খাওয়াবে না বলে, একবার উঁকি দিতেও যাব না? আমরাও কত কথা বলেছি ওদের নামে—কত গবেষণা চালিয়েছি। গরীব বোকা পাঁচীরা এমনিভাবেই খোলার ঘরের নষ্ট মেয়েতে পরিণত হয় বলে কত আপসোস করেছি। সামাজিক বিয়ে হচ্ছে ওদের, আমরা একবার যাব না, পাঁচীকে দু-একটা উপহার দিয়ে জানাবো না আমরা কত খুশি হয়েছি?

অনিল বলে, সে হিসাবেও বটে, আবার এ হিসাবেও বটে যে ওর মত শক্ত মেয়ে আমরা

চাই। এতটুকু ভয় করেনি, যার সঙ্গে ভাব হয়েছে সংস্কারের খাতিরে তাকে বিগড়ে দেয়নি,—

বিনয় উপস্থিত ছিল, সে হঠাৎ থেমে যায়। কান্তা কড়া চোখে চেয়ে আছে।

কান্তা আর অনিলের মধ্যেও যে অনেক দিনের ভালবাসা, সে কথা মনে আছে কিন্তু কেন যে তার খেয়াল থাকে না কান্তার সামনে এরকম মন্তব্য করা উচিত নয়! কান্তাও তো এরকম অনিলের কুসংস্কার এবং নিজের সংস্কারকে খাতির করে তাকে জয় করার কোন চেষ্টাই করে না!

ভিতরে যাই হোক, বাইরে কান্তার কোনরকম ভাবান্তর দেখা যায় না বলে কি ওটা তার খেয়াল থাকে না?

অনিল বলে, যাই হোক, পাঁচীকে আমাদের বোনের মতই ধরতে হবে। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, ওকে বোনের মতই মনে করে ওর বিয়েতে আমাদের যেচে যাওয়া উচিত।

মুকুল মুখ বাঁকিয়ে বলে, কি যা-তা কথা যে তুই বলিস! ওসব বিশ্রী ব্যাপারে কেউ যায়?

ঃ আগে বিশ্রী ছিল, এখন তো সুশ্রী হতে চলেছে।

ঃ এ আবার কখনো সুশ্রী হয়— পাপ করলে এমনি করে কখনো কি খণ্ডায়! পাপ-টাই চলবে, দশজনের মুখ শুধু চাপা পড়ল।

কান্তা চুপিচুপি বকুলকে এক সময় জিজ্ঞাসা করে, তোর কেমন লাগছে রে বকুল?

ঃ কেমন লাগছে মানে?

ঃ গা ঘিন ঘিন করছে না?

বকুল বলে, আগে করত, এখন আর করে না। কি জানি, আমার এখন কেমন লাগছে বুঝতেই পারছি না।

ঃ খুশি হোসনি?

ঃ বুঝতে পারছি না!

ঃ কার্তিক যদি শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে না করত, বাড়ি থেকে মেয়েটাকে যদি তাড়িয়ে দিত— তাহলে তোর ভাল লাগত?

বকুল মুখ গম্ভীর করে বয়স্কা গিন্নিবান্নির মত বলে, কি সব যে কাণ্ড চলে সংসারে!

কান্তা জিজ্ঞাসা করে, তুই যাবি না বিয়ে দেখতে?

বকুল বলে, ও বাবা! গঞ্জনা দিয়ে দিয়ে দিদি আর ছোটপিসী মেরে ফেলবে না আমাকে!

আরও খানিকক্ষণ বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলে কান্তা বেরিয়ে যায়, দেখতে পায় বাইরের দরজার কাছে বকুল দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট একজোড়া দুল তার হাতে দিয়ে বকুল বলে, আমার হয়ে এটা পাঁচীকে দিও, কেমন? বাড়ীতে যেন না জানে!

পাঁচ

স্বামী যাকে নেয় না, চিরদিনের জন্য যাকে ত্যাগ করে স্বামী যার আরেকজনকে বিয়ে করে নতুন ঘর-সংসার পেতেছে, সে-ও বিধবারই সামিল বৈকি !

খোরপোশ বাবদ অপূর্ব মুকুলের নামে পনেরটা টাকা পাঠায় ।

আজকের দিনে কেউ যেন বেঁচে থাকতে পারে মাসে পনের টাকা ভাতা পেয়ে !

এটুকুও আদায় হয়েছে অনিলের জন্য ।

প্রমোদ অনেকবার হাঁটাহাঁটি করেছে জামায়ের কাছে, চিঠি লিখেছে গণ্ডা গণ্ডা ।

প্রথম দিকে দু'চারবার অপূর্ব তার সঙ্গে দেখা করেছে, তাকে প্রণামও করেছে। গম্ভীর নতমুখে নীরবে শুনে গেছে তার অনুনয়-অনুযোগ এবং অনুরোধ ।

প্রথমে বছরখানেক তার অনুযোগের যুক্তিও ছিল একটাই, অনুনয় অনুরোধের ভিত্তিও ছিল একটাই ।

বিয়ে করা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে নেই—সেটা মহা অনিয়ম, সেটা মহাপাপ ।

আরেকটা বিয়ে করেছে বলেই কি আগের বৌটাকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে ?

ব্যাটাছেলে একটার বেশী বিয়ে করে না ? খুশি হলে একটা কেন দশটা বিয়ে করতে পারে পুরুষ মানুষ—একশ'টা বিয়ে করতে পারে ।

তার মেয়ের সঙ্গে যে বনিবনা হয়নি, তার মেয়ে যে তার মনের মত হয়ে উঠতে পারেনি—এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী তার মেয়ে ।

কিন্তু মনের মত নয় বলেই কি বিয়ে করা বৌকে মানুষ একেবারে ত্যাগ করে ?

মুকুলকে এনে অপূর্ব ঘরে রাখুক—দাসীর মত রাখুক ।

আধ পেটা খাবে, সতীনের ছেঁড়া শাড়ী পরবে, দিবারাত্র খাটবে, মুখ বুজে থাকবে ।

যুবতী মেয়ে, স্বামীর ঘরে ক্রীতদাসীর অধম হয়ে থাকলেও আর কোন বজ্জাতের সাধ্য হবে না তার কাছে ঘেঁষে, কারো কিছু বলারও মুখ থাকবে না।

একথাটা কি ভাবে না অপূর্ব ? যুবতী বৌ—তার কাছে যে ভাবেই থাক, ঠিক থাকবে তার বৌটা । বাপের বাড়ি পড়ে থাকতে থাকতে মনের ঘেন্নায় যদি কিছু করে বসে, বদলোকের প্রলোভনে যদি বিগড়ে যায়—লোকে কি বলবে প্রমোদের মেয়ে বিগড়ে গেছে ?

লোকে বলবে না যে কেলেঙ্কারি করেছে অপূর্বের স্ত্রী ?

অপূর্ব নীরবে শুনে যেত, জবাব দিত না ।

একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিল, মুখ বুজে মানিয়েই যদি চলতে পারবে আপনার মেয়ে, বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম কেন ? আবার একটা বিয়ে করার ঝকমারি পোয়ালাম কেন ?

একটু থেমে বলেছিল, আপনার বেয়ানকেই বরং জিজ্ঞাসা করে জেনে যান আপনার মেয়ের বজ্জাতিপনার ব্যাপার ।

অপূর্বর মা তালপাতার সেপাইনীর মত রোগা লম্বা রস-কষহীনা মানুষ ।

কায়দায় কথা বলতে অদ্বিতীয়া।

ভাসা ভাসা ভাবে এ বিষয়ে ও বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ হয়েছিল খানিকক্ষণ, তার মধ্যে এসে গিয়েছিল বাড়িতে ভাড়াটে পোষার বিষম সমস্যার কথা।

একটি ছোটখাট কেরাণী পরিবারকে বাড়ির একখানা মাত্র ঘর তারা ভাড়া দেয়।

এতটুকু বাড়িতে ক'খানা মাত্র ঘর, মানুষ অনেক।

তবু উপায় কি!

যে দিনকাল!

জানা চেনা একজনকে একখানা ঘর ভাড়া দিয়েছিল প'চিশ টাকায় কয়েক বছর আগে।

স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চাকে ভাড়া দিয়েছিল ঘরটা।

আজ পাঁচটা বাচ্চায় বোঝাই হয়ে গেছে ঘরটা, ছোট বড় জীবন্ত বাচ্চার গুদামের মত। একটা ঘরের গুদামের বাইরে তাদের এলাকায় ছিটকে ছিটকে এসে সারাদিন ঝনঝাটের সীমা রাখছে না তারা। অথচ এমনি মুশকিলের ব্যাপার তাদের, এমন বিশ্রী সব আইন-কানুন যে ভাড়াটেটাকে বিদায় দিয়ে স্বস্তি পাবার সাধ্য নেই তাদের।

প্রমোদ ঝোপ বুঝে কোপ মেরে বেশ কায়দা করেই আসল কথাটা তুলেছিল—এত ঝনঝাট সইতে হয়, ভাড়াটে তাড়িয়ে দেয়া যায় না। ছেলের বৌকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় সোজাসুজি।

অপূর্বর মা ঘাবড়ে যায়নি।

বলেছিল, বেয়াই, ভাড়াটে হল পর, ভাড়াটের বৌ বছর বছর বিয়োয় কি বিয়োয় না আমার তাতে কি? ছেলের বৌ হল ঘরের বৌ, সে যদি—

প্রমোদ এতবার এসেছে গিয়েছে, তার সঙ্গে কে কেমন আছে তাই নিয়ে দু'একটা কথা বলাবলি করেই আড়ালে সরে গিয়েছে অপূর্বর মা। আমল দেওয়া দূরে থাক, একবার বসতে পর্যন্ত বলেনি!

মুকুলের অপরাধের বিবরণ শোনার আবেদন নিয়ে আজ তার কাছে হাজির হতেই যেন একেবারে অন্যমানুষ হয়ে গিয়েছে অপূর্বর মা।

কুটছিল তরকারি। মস্ত ঝুড়ি বোঝাই রকমারি রাশিকৃত তরকারি।

অবস্থা তাদের স্বচ্ছল!

বাপ-ব্যাটায় মিলিয়ে অপূর্বদের যা রোজগার তাতে সারা মাস মাছ মাংস অনায়াসেই ব্যবস্থা করা যায়।

কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে তারা নিরামিষ ভোজী।

রাশিকৃত তরকারি খায়। মাছ মাংসের স্বাদ জানে না।

হন্ত দন্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটোছুটি করে না, ঝনাৎ করে ব'টিটা কাৎ করে, হুকুম করে অপূর্বর দ্বিতীয় পক্ষের কচি বৌটাকে দিয়ে কার্পেটের আসন আনিয়ে এবার অপূর্বর মা তাকে আদর করে বসতে দেয়, দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে রেকাবিতে সাজিয়ে দেয়।

অনর্গল বলে যায় এলোমেলো উল্টো-পাল্টা কড়া মিঠে কথা।

প্রমোদ অবশ্য কেবল আসনে বসেছিল—সাজানো রকমারি দোকানের খাবার স্পর্শও করেনি।

অপূর্বর মা-ও জানত যে খাবার সে স্পর্শ করবে না।

প্রমোদ হাঁটু চাপড়ে চড়া গলায় বললে, না না, ওসব কোন ডিফেক্ট আমার মেয়ের নেই। এমনি একটা অসুখ হয়েছিল—বিষয় রকম অসুখ কিন্তু দু'চার দিনের ব্যাপার। স্পেশালিষ্ট দেখালাম—তিন চার শ' টাকা জলে গেল। স্পেশালিষ্ট পরিষ্কার বললে, কোন গোলমাল নেই, কোন খুঁত নেই। এরকম স্বাস্থ্য খুব কম মেয়ের দেখা যায়!

অপূর্বর মা অপূর্বভাবে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল।

ঃ বেয়াই, স্বাস্থ্য তো ভালই ছিল তোমার মেয়ের। স্বাস্থ্য এখনো ভাল আছে নিশ্চয়। নইলে তোমার মেয়েকে দেখেই ছেলে আমার খেপে যায়, তোমার মেয়েকে বিয়ে করবেই করবে!

প্রমোদ বুঝে উঠতে পারছিল না ব্যাপারটা। বিয়ের পর প্রায় আড়াই বছর স্বামীর অন্ন ধ্বংস করেও সন্তানের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিতে পারেনি বলেই কি তবে মুকুলকে বিদায় করা হয়নি?

মুকুল বন্ধ্যা নয়—মস্ত ডাক্তার একথা স্পষ্ট বলেছে। বিয়ের পর দু'বছর ছেলেমেয়ে হয়নি—সন্তান সম্ভাবনার সূচনা শুরু হয়নি, এই সনাতন অপরাধেই তবে কি এরা মুকুলকে ত্যাগ করেনি?

অন্য কোন অপরাধ করেছে মুকুল?

কিন্তু বোঝাপড়া এভাবে চালিয়ে গেলে দিন কেটে যাবে, রাত কেটে যাবে, কোন স্পষ্ট কথায় তারা পৌঁছতে পারবে না কিছুতেই।

প্রমোদ তাই কথা পেড়েছিল, এত ভাল মানুষ আপনি বেয়ান, এত বোঝেন শোনেন ব্যবস্থা করেন—মেয়েটা কি এমন দোষ করল যে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন?

একটু কুঁজো হয়ে বসেছিল অপূর্বর মা, ছিলা-কাটা ধনুকের মত সে ছিটকে সোজা হয়ে যায়।

ঃ লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি? মেয়েকে জিজ্ঞাসা করবেন বেয়াই। মেয়ে যে আপনার জ্যান্ত ফিরেছে, ওটাকে খুন করে পোড়াকপালে ছেলেটা আমার যে ফাঁসি যায়নি, আপনার মেয়েকে বিধবা করেনি—এটাই অনেক কপাল বলে জানবেন বেয়াই।

প্রমোদ কি ভেবে এতক্ষণে দুটো একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে চুপচাপ গিলেছিল। এক গ্লাস জল এক নিঃশ্বাসে শুষে নিয়েছিল।

ঃ কপাল—সত্যি কপাল। এমন শাশুড়ী পেল, এমন স্বামী পেল—তবু মেয়েটা মানিয়ে চলতে পারল না!

মুখ বাঁকিয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে অপূর্বর মা।

বলে, জানেন? ছেলে যদি আপনার মেয়েকে কেটে ফেলত, আমিও বলতাম বেশ করেছিস্।

লম্বা হয়ে গিয়েছিল প্রমোদের মুখ। সে-ও তো সংসারী মানুষ, দীর্ঘকাল ধরে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে টানতে টানতে বুড়ো হয়েছে।

মোটাসোটা গোটা গোটা নিয়মগুলি তো অজানা নয় তার!

এবার মাথা হেঁট করেছিল প্রমোদ।

অন্য সব কিছু নিয়ে মেয়ের পক্ষে বাপ লড়তে পারে কিন্তু মেয়ের সতীত্বের প্রশ্ন উঠলে মাথা নীচু করে চুপ করে থাকতে হবেই মেয়ের বাপকে।

সতীত্ব?

স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তা মনে আনাও যে মহাপাপ - সেই বিচার?

কী সর্বনাশ!

ঃ বেয়াই, সোজা কথা বুঝিনে, মরতে চলেছি? মেয়ে আপনার সোয়ামী নিয়ে খুশি নয়, আল্‌গা পিরিত চায়। সোয়ামী রইল হাতের পাঁচ, আলতো পিরিতের মজা লুটতে চায় আলগোছে। তা ঘরের বৌয়ের এ ব্যারাম ক'দিন লুকোনো থাকে সোয়ামী বা শাশুড়ীর কাছে?

এতক্ষণে প্রমোদের মাথা ঘুরছিল।

মাথাটা তাই নীচু করেই রেখেছিল প্রমোদ।

অপূর্বর মা যেন পরমানন্দে উপভোগ করেছিল ভীত সন্ত্রস্ত প্রমোদের দিশেহারা ভাবটা।

ঃ শাশুড়ীরা চিরকালের বৌ-কাটুনি। মাছ কেটে কেটে হয় মেছুনী, বৌ কেটে কেটে হয় শাশুড়ী। বৌ-ও পাজী বজ্জাত হতে পারে তা যেন বৌ-কাটুনি শাশুড়ীদের বানানো মিছে কথা! শুধু এইটুকুই তো জানে জগৎ-সংসার। আমি আপনার মেয়েকে তাড়াইনি বেয়াই, যা করেছে ছেলে—বললে এটা বিশ্বাস হবে কি বেয়াই মশাই?

প্রমোদ এবার মাথা তুলেছিল।

ঃ বুঝেছি। মেয়েটাকে কেটে কুটে ভাসিয়ে দেব কিনা বলে দিলেই চুকে যেত না কি বেয়ান ঠাকরুণ? ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে তাই করতাম, খবর পেতেন আপনার বজ্জাত বৌটা বেঁচে নেই। আমিই নয় ফাঁসি যেতাম– অমন মেয়ের বাপ হবার প্রায়শ্চিত্ত করতাম। কিন্তু অনেক শুনলাম—মেয়েটা ঠিক কি কাণ্ড করেছিল, সেটাই শুনলাম না।

ঃ বলতে গেলে বুক ফেটে যায় বেয়াই।

ঃ শুনতে চেয়ে আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে বেয়ান!

ঃ তবে বলি। খুলেই বলি।

নির্জন দুপুর নয়, বেলা বারোটার ব্যাপার। কলঘরে নাইতে গিয়ে শাশুড়ীর কানে গেল মুকুলের চীৎকার।

বাড়িতে ছিল কেবল মুকুলের পিসতুতো সম্পর্কের দ্যাওর ভূপেন। ভিজে কাপড়ে

ছুটে এসে শাশুড়ী দেখেছিল, ভূপেন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর মুকুল কাঁদতে কাঁদতে কাঁপছে।

প্রমোদ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলেছিল এ কি কথা বলছেন বেয়ান? জগৎ-সংসার চলতি নিয়ম-কানুন বিচার-বিবেচনার একেবারে উল্টো কথা কইছেন? দ্যাওর বখামি করতে এলে চেঁচিয়ে উঠল তবু দোষ হল আমার মেয়ের?

শাশুড়ী বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, ন্যাকা সাজবেন না বেয়াই, অনেক বয়েস হয়েছে, অনেক দেখেছেন শুনেছেন—মনে মনে বেশ বুঝেছেন ব্যাপার। বজ্জাতি বুদ্ধি না থাকলে মেয়েলোক ওভাবে চেঁচায়? ডাকাত নয়, গুণ্ডা নয়, বিশ বছরের নিরীহ গোবেচারী ঘরের ছেলে। জন্ম থেকে দেখছি ভূপেনকে, আমরা ওর স্বভাব জানিনে?

প্রমোদ চোখ বুজে বলেছিল, মিটমিটে শয়তানও থাকে সংসারে, বয়েস কালে ভাল-ছেলেও হঠাৎ ঝোঁকের বশে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে—

ঃ বেশ তো, বেশ তো, তাই সই। ভূপেনের মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিল। মেয়ে তোমার চেঁচাল কেন? একটু চোখ রাঙালে, একটু ফোঁস করে উঠলে ল্যাজ গুটিয়ে পালাত না ভূপেন? আমি বাড়ি রয়েছি, ওর প্রাণে ভয় নেই? বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায়? গালে একটা চড় কষিয়ে দিলেই হত! দাঁত আছে, কামড়ে দিলেই চুকে যেত!

ঃ ছেলেমানুষ, হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে—

শাশুড়ী মাথা নাড়ে, না বেয়াই, দশজনাকে জিজ্ঞেস করবেন—কু-মতলব না থাকলে ওভাবে কেউ চেঁচায় না।

ঃ ভূপেন কি বলে?

ঃ কি আর বলবে, আর কি এ বাড়িতে ফিরেছিল ভূপেন? সোজা চলে গিয়েছিল বাপের কাছে। ক'দিন বাদে ওর বাপের চিঠি এল—যে বাড়িতে ডাইনী পোষা হয় সে বাড়িতে ছেলেকে রাখবে না, যত বেশি খরচ পড়ুক সে হোস্টেলে থেকে পড়বে!

প্রমোদের দিশেহারা ভাব কেটে গিয়েছিল, কিন্তু অনেকক্ষণ সে কথা বলেনি, গুম খেয়ে থেকেছিল। অপূর্বর মা পাকা মানুষ, সে টের পেয়েছিল প্রমোদের মনের ভাব।

অনেক চোখা চোখা জোরালো যুক্তি-তর্ক তার মনে জাগছে কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই জেনে প্রাণপণে সে নিজেকে সংযত করে রেখেছে।

সে-ও সংসারের ঘা-খাওয়া পাকা মানুষ, কথা কাটাকাটি চালিয়ে যে সংসারের বাস্তব সমস্যার মীমাংসা করা যায় না, এটা সে হাড়ে হাড়ে বোঝে।

অনেকক্ষণ পরে সে ধীর সংযত গলায় বলেছিল, হ্যাঁ বেয়ান, মেয়ে আমার বোকামি করেছে। কিন্তু ওর কোন কু-মতলব ছিল এটা আপনারা ধরে নেবেন না। ছেলেমানুষ বুঝতে পারেনি, বোকামি করে ফেলেছে। ওটা ক্ষমা করে আরেকবার দেখুন মেয়ে আমার মানিয়ে চলতে পারে কি না!

অপূর্ব কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে প্রায় ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে তার মা বলে, মাপ

করবেন বেয়াই। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মাথা কাটা গেছে। ওই ধাক্কাই এখনো সামলাতে পারিনি—ও বৌকে আবার ঘরে আনলে সবাই সম্পর্ক তুলে দেবে।

বোকামি বৈকি! চরম বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। অল্পবয়সী বাড়ির ছেলে, সে একটু ইয়ার্কি দিতে এলে যে হৈ-চৈ করতে নেই বাড়ির অল্পবয়সা বৌয়ের—দোষ যারই হোক, এরকম একটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার জানাজানি হলে যে ক্ষতি তারই বেশী, এই সহজ বুদ্ধিটুকু সত্যিই মুকুলের থাকা উচিত ছিল।

প্রমোদের আপসোস ও ধিক্কার চুপচাপ শেষ পর্যন্ত শুনে গিয়ে মুকুল বলে, তা তো জানি—পাগলের মত একেবারে জাপটে ধরলে যে! ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

এত ভয় সে কেন পেল সে প্রশ্ন অবশ্য কেউ তাকে করেনি। তার দেহমনের তদানীন্তন অবস্থাটা তো আর কারো বিচার-বিবেচনার বিষয় নয়। সবাই অন্যভাবে চিন্তা করে।

সত্যই তো, কি করত ভূপেন তার? গুণ্ডা নয়, কলেজে পড়া বিশ বছরের ভাবপ্রবণ ছেলে—তাকে অনায়াসেই সামলানো চলত।

তারপর চেঁচিয়ে ওঠা তো হাতেই ছিল।

শুচি শুদ্ধতার বাই বা বিকার থেকে যে জন্মেছিল ওই ভয়, ছেলেমানুষ একজন ভাবাবেগে জাপটে ধরলেই দেহ অপবিত্র হয়ে যায় এই ধারণা থেকেই যে জন্মেছিল ওই আতঙ্ক, এটা আগেও জানা ছিল না, আজও জানা নেই।

কয়েকদিন পরে প্রমোদ গিয়েছিল ভূপেনের হোস্টেলে।

নানা কথা বলার পর, খারাপ না হয়েও সংসারে মানুষ কতরকম ভুল করে বসে তার কতগুলি উদাহরণ শোনানোর পর, স্নেহভরা মিষ্টি সুরে বলেছিল, তুমি ছেলেমানুষ এটা কি কারও অজানা বাবা? তুমি একাই কি একটা ছেলেমানুষি করে ফেলেছ? এরকম ঘটে যায়—সবাই তা জানে। চুপচাপ থাকলে তোমার ক্ষতিটা কি হত বাবা? দুদিন একটু লজ্জা পেতে, তারপর সবাই ভুলে যেত ব্যাপারটা।

টু শব্দটি না করে ভূপেন মেঝেতে চোখ বিঁধিয়ে একেবারে পাথরের মূর্তির মত বসেছিল।

ঃ তার বদলে তুমি একজনের জীবনটা নষ্ট করলে? সে তো তোমার পরও নয় বাবা!

ভূপেন নড়েনি, চোখ তোলেনি, কাঁপা গলায় বলেছিল, আমার সঙ্গে অনেকদিন ধরে খেলা করছিল। নইলে হঠাৎ মাথা বিগড়ে আমি কখনো—

মুকুল তার সঙ্গে খেলা করছিল, অনেক দিন ধরে খেলা করছিল! মুকুল!

ঃ তুমি ভুল বুঝেছিলে বাবা। ওরকম খেলা আমার মেয়ে কোনদিন শেখেও নি, জানেও না। ওরকম খেলার মানেই সে বোঝে না। বুঝলে অবশ্য ভালই হত—এরকম বিপদ ঘটত না। স্কুলে পড়েনি, নাটক নভেল পড়েনি, ছেলেবেলা থেকে ব্রত পুজো নিয়ে মেতে থেকেছে—

ভূপেন চুপ করে ছিল।

ঃ আমি বুঝেছি ব্যাপারটা। তুমি আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়ছ, নিরীহ শান্ত সুন্দর স্বভাবের ছেলে, মুকুলের একটু মায়া পড়েছিল তোমার ওপরে। তোমায় একটু স্নেহ করেছিল। বিশ্বাস কর, আমার মেয়ে ধারণাই করতে পারে না স্বামী ছাড়া কারো সঙ্গে ওরকম কোন খেলা কেউ করতে পারে। স্বামীর সঙ্গেও কোনরকম খেলা চলে এ ধারণাও ওর নেই। ও ধরনের খেলাই সে জানে না।

আরও খানিকক্ষণ প্রমোদ কথা বলেছিল।

ভূপেন শুনে গিয়েছিল গুম খেয়ে থেকে।

তারপর প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমায় কি করতে বলেন? অপুদা এমন করবে আমি ভাবতেও পারিনি!

ঃ ভাবতে পারলে কি তুমি চুপচাপ থাকতে বাবা? তুমি কি সেরকম ছেলে? কি আর তোমায় করতে বলব বল। সবই আমার অদৃষ্ট!

ভূপেন বোধহয় দু'একদিনের মধ্যেই সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে, কি ঘটেছিল খোলাখুলি সব জানিয়ে এবং ভাবোচ্ছ্বাসের ফেনা ফুটিয়ে আবোল তাবোল অনেক কথা গেঁথে অপূর্বকে চিঠি লিখেছিল।

কারণ, তৃতীয় দিনেই প্রমোদের কাছে পৌঁছেছিল মুকুলের শাশুড়ীর চিঠি— হাতের লেখা অপূর্বর।

বোকা হাবা ছেলেমানুষ একজনকে উস্কে দিয়ে এরকম চালাকিবাজি খাটিয়ে মেয়েকে তাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না প্রমোদের। তারা ঘাস খায় না— সবই তারা বোঝে। আরও কত বোকা সরল ছেলের মাথা চিবুবে মুকুল ঠিক নেই, তার চেয়ে প্রমোদ যা বলেছিল সেটা করাই ভাল—ওরকম ডাইনী মেয়েকে কুচি কুচি করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যায়।

তারপর অনিল গিয়েছিল অপূর্বর কাছে।

কোনরকম ভূমিকা না করেই সোজাসুজি বলেছিল, বেশ, আমার ডাইনী বোন আমাদের কাছেই থাকবে। তোমাকে খোরপোশ দিতে হবে।

অপূর্ব হেসে বলেছিল, তোমার বোনের খোরপোশের ভাবনা? একটা দোকানঘর সাজিয়ে লাগিয়ে দাও না! দু-একটা দালাল লাগিয়ে দিলে বোনের রোজগারে তোমাদেরও—

হঠাৎ রাগের মাথায় দিশে হারিয়ে নয়, ধীর, স্থির, শান্তভাবে, বিচার-বিবেচনা করে কত জোরে গালে চড়টা মেরেছিল জীবনে কোনদিন ভুলবে না অনিল।

কারো গালে চড় কষিয়ে যে হাতের তালু জ্বালা করতে পারে এটাও তার জানা ছিল না।

চড়ের ঘায়ে মোড়া থেকে মেঝেতে উল্টে পড়েছিল অপূর্ব।

ছুটে এসেছিল সকলে, হৈ-চৈ হা-হুতাশ করেছিল সোরগোল তুলে কিন্তু অনিলকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি।

বাড়ির লোকেরাই অপূর্বকে সামলে দেয়। অনেক কথাই অনিলের কানে আসে। মোট কথাটা অপূর্বকে যা বোঝানো হয় তার তাৎপর্য হল এই যে অনিল হয় নেশা করে এসেছে, কিম্বা তার মাথাটা বিগড়ে গেছে—সব কিছু ডোন্ট কেয়ার করে মরবার জন্য তৈরী হয়েই হয়তো অনিল এসেছে। ওকে উস্কে দিয়ে বোকার মত খুনোখুনি করার কোন মানে হয় না!

পাগলাটা যা বলে মেনে নিলেই চুকে যায়। তারপর কাজে কি করা হবে না হবে সে তো পরের কথা, মাথা ঘামাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

সামলে নিয়ে অপূর্ব আবার মোড়ায় বসলে, উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সামনেই অনিল বলেছিল, মুকুলের খোরপোশ তোমায় দিতেই হবে। মামলা করে যদি আদায় করতে না পারি, এমনিভাবে এসে হামলা করে করে আদায় করব।

স্তব্ধ হয়ে ছিল সকলে। অনিল বিদায় নেবার জন্য পা বাড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে সহজ সুরে বলেছিল, তোমায় খুন করে ফাঁসি যাবার জোরালো একটা সাধ মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। একটা কথা মনে রেখো, তোমার মত পশুকে খুন করে ফাঁসি যাওয়া দরকার মনে করলে প্রাণের মায়া আমায় ঠেকাতে পারবে না।

তারই ফলে স্বামীর কাছ থেকে মুকুল পনের টাকা খোরপোশ পায়।

পনের টাকা!

পনের টাকার প্রথম মণিঅর্ডার যেদিন এলো—অনিল বাড়ি ছিল না। সে বাড়ি থাকলে হয়তো বিবাহিতা স্ত্রীত্বের অধিকারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য স্বামীর কাছ থেকে সারা জীবন মাসে মাসে পনের টাকা খরচ গ্রহণ করা গোড়াতেই বাতিল হয়ে যেত। বাড়ি ফিরে ব্যাপার শুনে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল অনিল।

মুকুল সামলে ছিল তার রাগ।

বলেছিল, দাদা, দোহাই তোমার, মাথা ঠাণ্ডা কর। আরো বেশি সর্বনাশ করো না আমার। মাসে মাসে পনের টাকা পাঠাক, পাঁচ টাকা পাঠাক, পাঁচ আনা পাঠাক—তার মানে হবে তো আমার বৌ বলে মেনেছে?

একটু থেমে বলেছিল, অবিশ্যি, এ টাকায় না কুলোলে খেতে পরতে দিতে যদি নারাজ হও তোমরা—

অনিল আর কথা বলেনি।

ছয়

তার জন্য স্নেহ-মায়া শ্রদ্ধায়-ভরা ছিল যে হৃদয়-মন, এই বয়সের কাঁচা তাজা হৃদয়-মন—প্রেম জাগিয়ে সেই হৃদয়-মন জয়ের চেষ্টা তার ব্যর্থ হবে না—এটা একরকম জানাই ছিল বিনয়ের।

তবু যেদিন বকুল তার প্রেমকে মেনে নেয়, তার কথায় সায় দেয়—একেবারে যেন অপ্রত্যাশিত মনে হয় ব্যাপারটা, দেহ-মনের রোমাঞ্চকর আনন্দটা অদ্ভুত মনে হয়।

বকুল সায় দেবে জানা ছিল, সেদিন সন্ধ্যায় ওভাবে অত সহজে সায় দেবে এটা অবশ্য সত্যই তার জানা ছিল না।

হাতটি ধরে মৃদু স্নেহের সুরে শুধু সে বলেছিল, মনটা ঠিক করতে পারলে না বকুল?

অস্ফুট জবাব এসেছিল, ঠিক করেছি। তাই হোক।

নিজের কানকে বিশ্বাস হয়নি বিনয়ের।

: সত্যি বলছ তো? খারাপ লাগছে না তো?

বকুলের গলা কেঁপে কেঁপে যায়।

: তোমার এত বড় ভালবাসার মান না রেখে পারলাম না। ভাবলাম কি জানো? দোষ হবে কিনা, উচিত হবে কিনা- আমার চেয়ে এসব তুমি ঢের বেশী বোঝ। আমার অত মাথা ঘামানো কেন?

: এই সব ভেবে চিন্তে মন ঠিক করেছ হিসেব কষে। আসলটা তবে নেই!

: ইস্! উনি যেন জানেন না। আসলটা ছাড়া কোন মেয়ে এসব হিসেব কষে! প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছিল—জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছি।

বকুল একটু হাসে। কান্তাদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসো। কান্তাদি বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার মন ঠিক করে দিয়েছে।

বিনয় অভিমান করে বলে, তবে তো একই কথা দাঁড়াল—ভালবাসা নেই। ভালবাসা থাকলে কাউকে বুঝিয়ে মন ঠিক করে দিতে হয় না।

বকুল বলে, ভালবাসা নেই তো নেই! যা আছে তাই আছে। ওসব তুমি বুঝবে না—তুমি ভারি ছেলেমানুষ থেকে গেছ। ভালবাসা আছে বলেই তো—

: আছে বলেই তো?

: যাকে ভালবাসা যায় তাকে উচ্ছিষ্ট দিতে মন চায়? শুধু দোষের কথা ভেবেছি নাকি, পাপ-পুণ্যের কথাও ভেবেছি। তোমার জন্য পাপ করে নয় নরকেই যেতাম!

বিনয় বলে, আমার জন্য পাপ করে তুমি নরকে যেতে পার? এটা মিছে কথা বলছ!

বকুল একটু হাসে।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে বিনয় বলে, বেশ, পরীক্ষা করা যাক। দোষ তো কেটে যাবেই, বিয়ে তো আমাদের হবেই।

বকুল মুক্তি লাভের চেষ্টা করে না, বলে, ছি, ছেলেমানুষি করতে নেই। সারাজীবন একসাথে কাটবে, আমার শ্রদ্ধায় ঘা দিলে তোমারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি।

বিনয় তাকে ছেড়ে দিয়ে হাসি মুখে বলে, পাগল হয়েছ? আমি কি সত্যি সত্যি বলছিলাম! তবে তোমার মন আবার বেঠিক হয়ে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিলে নিশ্চিত থাকা যেত।

: আমার মন আর বেঠিক হবে না।

বিনয় একটু ভেবে বলে, বাড়ির লোকের কথা ভেবেছ ?

বকুল বলে, ভেবেছি বৈকি। দাদার খুশির সীমা থাকবে না—বাবা একটু খুঁত খুঁত করলেও বাধা দেবে না। মা সোজা ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে চুপি চুপি কাঁদবে—কিছু বলবে না। চেঁচামেচি হৈ-চৈ জুড়ে দেবে ঠাকুমা, পিসীমা আর বড়দি।

একটু ম্লান দেখায় বকুলের মুখ।

ঃ দিদিই লাফাবে সবচেয়ে বেশী—কি করবে ভাবতেও পারছি না। হৈ-চৈ কাণ্ড করে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে—আর কোন দিন আসবে কিনা কে জানে!

বিনয় ভাবে, কতকাল কেটে গেছে বিদ্যাসাগরের লড়াই আর জয়ের পর।

কত বাড়ির বন্ধ অন্তঃপুরে এই সব পচা বিকার আজও জাঁকিয়ে রয়েছে। একদিকে কোথায় এগিয়েছে এদেশের মানুষ—বিকার ঝেড়ে ফেলে বিজ্ঞানকে বরণ করে নিয়ে, অন্যদিকে কত পিছনে কী অন্ধকারে রয়ে গেছে এদেশেরই মানুষ!

বকুলের মনের বাধা কি সম্পূর্ণ কেটে গেছে ?

সবটা কেটে যায়নি, এখনো খুঁতখুঁতানি আছে; ছেলেবেলা থেকে পোষণ করা সংস্কার একেবারে মরে না। কিন্তু বিনয় বুঝতে পারে যে যতটুকু পরিবর্তন সে ঘটাতে পেরেছে বকুলের মনের ভাবে তার ফলে এটুকু এখন আশা করা চলে যে তার সঙ্গে সামাজিক ভাবে সমর্থিত মিলনের কথা ভেবে একটা নৈতিক অপরাধ করার অস্বস্তি আর জাগবে না বকুলের মধ্যে।

এখন সে যদি তাকে চায়, নির্জন পরিবেশে খানিকটা আবেশ বিহ্বলতা সৃষ্টি করে সোজাসুজি চায়—

পাপ-পুণ্যের হিসাব নিয়ে একটু খুঁতখুতানি বজায় থাকলেও বকুল খুশি মনেই ধরা দেবে।

ওভাবে অবশ্য বকুলকে সে কামনা করে না।

তার নিজের মনটাও কি বদলে যায়নি এতদিন বকুলের মন জয় করার অভিযান চালিয়ে এসে!

বকুলের যেটুকু দ্বিধাবোধ এখনও বজায় আছে সেজন্য বিনয় তাই চিন্তা করে না।

এখন যেটুকু অস্বস্তি সে বোধ করছে—দু'দিনে সেটুকু কেটে যাবে, বিয়েটা চুকে যাবার পর।

বকুলের এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য বিনয় কান্তার কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

কতদিন ধরে কত ধৈর্যের সঙ্গে কান্তা তাকে বুঝিয়েছে জীবনের রীতি-নীতি উচিত অনুচিতের ব্যাপার। কান্তার সাহায্য না পেলে বকুলের কুলুপ আঁটা বন্ধ মনের অন্ধ সংস্কারের পচা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে তাজা বাতাস এনে দেওয়া কঠিন হত তার পক্ষে।

কিছুকাল আগেও বকুল মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে জন্ম-জন্মান্তরে মেয়েদের এক-জন দেবতাকেই দেহ-মন সমর্পণ করে জীবন কাটাতে হয়। তার এই বিশ্বাসের কাছে কোন যুক্তিতর্কই টিঁকত না।

বিদ্যাসাগরের মত ধার্মিক পণ্ডিতের বিধান দেওয়া আছে ? আইন আছে ?

আছে থাক ! বকুল যা পাপ বলে জানে, কারো বিধানে, কোনো আইনে সেটা পুণ্য হয়ে উঠতে পারে না !

তার পক্ষ নিয়ে কান্তা উঠে পড়ে না লাগলে বকুলের এই বিশ্বাসকে জয় করে তার মনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হত না বটে কিন্তু আরও কতদিন তাকে কঠিন সাধনা চালিয়ে যেতে হত কে জানে।

সর্বাগ্রে সে কান্তাকেই খবরটা জানায়।

বলে, তোমার জন্যই এটা সম্ভব হল। নইলে সহজে ওকে রাজী করাতে পারতাম না।

কান্তা খুশি হয়ে বলে, রাজী হয়েছে ? হবে না ! উঠে পড়ে লেগে কীভাবে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি ভালবাসা করা পাপ নয়, সংস্কারের খাতিরে ভালবাসার অপমান করাটাই বরং মহাপাপ !

বলতে বলতে মুখের ভাব বদলে যায় কান্তার।

ঃ নাঃ, আমার বোঝানো, তোমার তপস্যা – এসব আসল কারণ নয়। সত্যি ওর মনে ভালবাসা এসেছে। এসব সরল কাঁচা মানুষের ভালবাসা কেমন হয় জান তো ? আদর সোহাগ ভালবাসা এসব তুমি একলা দেবে। ও শুধু নেবে– কৃতার্থ হয়ে নেবে।

বিনয় ভাবে, নিজের কথা হঠাৎ কি মনে পড়েছে কান্তার ? তাই এমন ভাবে বদলে গেল তার মুখের ভাব ?

কান্তা তার চিন্তাটা মোটামুটি আঁচ করে বসবে সে এটা অবশ্য কল্পনাও করতে পারেনি।

কান্তা বলে, ভাবছ বুঝি যে এটা আমার অভিজ্ঞতার উপদেশ ? না—আমার অভিজ্ঞতা বড় তিতো। মানুষটা কি চেয়ে পেল না, কি পাবে না টের পেয়ে সরে গেল, আমি মোটেই বুঝি না। আমি তোমায় সহজ জ্ঞানের কথা বলছি। আমার মন একদিন কেমন ছিল সেই হিসাবে ধরে। আমিও একদিন বকুলের মত ছিলাম তো, ওর মত বয়সে ওর মত সংস্কারে ঠাসা কাঁচা মন নিয়ে আমিও তো কল্পনা করতাম—মনের মত বরের কাছে কি পেলে আমি কৃতার্থ হব।

কান্তা একটু হাসে। তার নতুন ধরনের জ্বালাভরা হাসি—চিরদিন রসে আনন্দে টইটুম্বুর হয়ে থেকে সর্বদা যে মিষ্টি হাসি তার মুখে লেগে থাকত সে হাসির চিহ্নও মিলিয়ে গেছে।

তার হাসি বিনয়ের মুখ পর্যন্ত ম্লান করে দেয়।

কান্তা বলে, ভুল বুঝো না। বকুল প্রতিদান দেবে। তোমার একটু আদরে একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাবার প্রতিদান। তোমাকে দেবতার মত ভক্তি করার প্রতিদান।

বিনয়ও একটু হাসে। তার হাসিটুকুও এত বেশী জ্বালাভরা মনে হয় যে কান্তা আশ্চর্য হয়ে যায়।

বিনয় বলে, কি কপাল আমাদের ! সত্যিকারের প্রেয়সী পাওয়া অসম্ভব। মেয়েদের ভালবাসা মানেই দাঁড়াবে ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা যত্ন—অন্যায় অবিচার মুখ বুজে সহ্য করা।

কান্তা বলে, আমাদেরই বা কি কপাল! কর্তা ছাড়া প্রেমিক পাওয়া অসম্ভব। পুরুষের ভালবাসা মানেই দাঁড়াবে আদর সোহাগ মায়া মমতা—আব্দার আর অভিমানের মান রাখা।

বিনয় বলে, তাই বটে। সোজা কথা দাঁড়াচ্ছে যে সমানে সমানে ছাড়া সত্যিকারের প্রেম হয় না!

কান্তা বলে, কথাটা সোজা, কিন্তু বুঝতে বুঝতেই আমাদের আসল জীবন পার হয়ে যায়।

তাই বা ক'জন বোঝে?

সাত

অনিল একটা চাকরি পেয়েছে। সম্প্রতি একটা বড় রকম রদবদল হয়েছে মুখার্জি কোম্পানীতে।

অফিস চালানোর ব্যাপারে বড় সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিল নিয়োগী নামে একজন প্রৌঢ়বয়সী লোক।

অফিসে পর পর কয়েকবার গোলমাল আর হাঙ্গামা হবার পর একদিন মদের ঝোঁকে সাহেব তাকে তাড়িয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগী সেটা মেনে না নিলে পদটাতে অবশ্য সে-ই বহাল থাকত— মদের ঝোঁকটা কেটে যাবার পর সাহেব তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করার ভঙ্গিতে তার পিঠ চাপড়ে দিত।

কিন্তু অফিসটা সত্যিই বড় গরম হয়ে উঠেছিল— ঘনিয়ে আসছিল বড় রকম একটা গোলমাল।

নিয়োগীর কায়দায় দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে তিনবার হেরে গিয়ে কর্মচারীরা এবার ভাল করে আঁট-ঘাট বেঁধে তোড়জোড় চালাচ্ছিল আরেকবার হাঙ্গামা করার।

কে জানে কি অবস্থা দাঁড়াবে! নিয়োগীর ছিল অফিস চালাবার সুনাম – অন্য একটা বড় অফিস বেশি মাইনেয় তাকে লুফে নেবার জন্য তৈরী হয়েই ছিল।

নিয়োগী সোজা সেখানে গিয়ে যোগ দেয়। তার শূন্য পদটা পায় কানাই মুখুজ্যে।

তার সাথে রেসের মাঠে প্রমোদ অনেক টাকা উড়িয়েছে। বন্ধুত্বের দাবি তেমন না থাকলেও, ওই সম্পর্কের দাবিতে প্রমোদ ছেলের জন্য একটা কেরাণীর চাকরী বাগাতে পেরেছে অনেক চেষ্টায়।

অনিলের চেষ্টায় কার্তিক ওই অফিসে পেয়েছে একটা পিয়নের পদ। বিশেষ ধরাধরি অনিলকে করতে হয়নি, নতুন একজন পিয়নের প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠেছিল।

কান্তা জিজ্ঞাসা করে, কার্তিকের এটা কিসের পুরস্কার?

ঃ ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের পুরস্কার। চেষ্টা করে প্রেমকে সার্থক করেছে, পাঁচীকে সুখী করেছে। কি বদনামটাই রটেছিল—ওরা গ্রাহ্য করেনি। কার্তিকের বুড়ীমা বেঁচে থাকতে বিয়ে সম্ভব ছিল না, দু'জনে বুড়ীর মরার অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছে।

কান্তা বলে, বদনাম রটতে না দিয়ে ধৈর্য ধরলেই হত।

ঃ ওদের মধ্যে এই বয়সের মেয়ে-পুরুষে একটু ঘনিষ্ঠ মেলামেশা হলেই বদনাম রটে যায়। সেইজন্যই তো বলছি—সব তুচ্ছ করে ভালবাসার মান রেখেছে। তবে একথা ঠিক, আগে চাকরিটা পেলে কি আর মা'র মরার জন্য কার্তিক অপেক্ষা করত!

ঃ ওরাই তাহলে সত্যিকারের ভালবাসা জানে—ওদের ভালবাসাই সার্থক হয়?

কে জানে কি ভাব থেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কান্তা!

অনিল বলে, তা কি বলা যায়? ওদের মধ্যেও কি ভুল করা নেই, ফাঁকি নেই, বজ্জাতি নেই? তবে ওদের সোজাসুজি কারবার, আমাদের মত জটিল নয়।

কার্তিককে অনিল জিজ্ঞাসা করে, তোর তো এখন ভালই চলছে, না? ঘরের ভাড়াও পাস, মাইনের টাকাও পাস।

কার্তিক ম্লান মুখে একটু হেসে বলে, বাড়ি ঘর ছিল দিদিমার, মরার সময় আমাকে দেয়নি, মাকে দিয়ে গেছে। পাঁচীর জন্য বদনাম শুনেছিল, দিদিমা চটে গিয়েছিল।

সে জিজ্ঞাসা করে, পাঁচী কেমন আছে রে?

কার্তিক একটু কাচুমাচু করে বলে, ভালই আছে।

ঃ তোর দিদিমারই খুব চোটপাট ছিল,—ঘর দুয়ার তার ছিল বলে? বিয়েটা ঠেকিয়ে রেখেছিল। বাড়ির অন্য সবাই তো ঠাণ্ডা ভালমানুষ?

ঃ ওই আছে একরকমের।

ঃ পাঁচীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে?

ঃ মেজাজটা সুবিধে নয় মা'র, চটাচটি করে। ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া কি মেয়েলোক থাকতে পারে বাবু?

ব্যাপার খানিকটা অনুমান করতে পেরে অনিল একটু ক্ষুব্ধভাবেই টেবিলে গিয়ে বসে। নিজের মা'র মরণের জন্য এতকাল ধৈর্য ধরে থেকে এখন পাঁচীর কপালে জুটেছে শাশুড়ীর চোটপাট।

ওরকম একটু অশান্তি সংসারে বোধহয় থাকবেই।

শাশুড়ী খারাপ। অন্যদিকে তো সুখী হয়েছে পাঁচী।

কেন সুখী হবে না পাঁচী?

অনিল ভাবে, নিশ্চয়ই পাঁচী সুখী হয়েছে—পরম সুখী হয়েছে! কার্তিক অজিত নয়—খেলা করে সে সরে যায় না—তার খাঁটি প্রেম।

এই প্রেম পেয়েও পাঁচী সুখী না হয়ে পারে?

আট

সুধীর অফিসে ফোন ধরে। সেদিন ফোনটা কানে লাগাতে প্রশ্ন এল: ম্যাডক মুখুজ্যে কোম্পানী ?

: হ্যাঁ, বলুন ;

: আপনাদের অফিসে কার্তিক কাজ করে—কার্তিক দাস ? ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলুন, ওর বৌ বিষ খেয়েছে। বলবেন, দীনেশ চৌধুরী খবর দিয়েছে।

কার্তিকের বৌ বিষ খেয়েছে, তাদের অফিসের বেয়ারা কার্তিকের বৌ ! কেমন অদ্ভুত আর অসঙ্গত মনে হয় কথাটা। কার্তিকের বৌকে অবশ্য সুধীর চোখেও দ্যাখেনি, কিন্তু কার্তিককে তো সে চেনে ভালভাবেই—ওর মত লোকের বৌয়ের পক্ষে বিষ খাওয়াটা তার কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপারের মত লাগে।

কারও রসিকতা নয় তো ? কার্তিককে অনিল কাজে লাগিয়েছিল খেয়াল করে সুধীর তাকে গিয়ে খবরটা জানায়।

অনিল এক মুহূর্ত চিন্তা করে। কর্মব্যস্ত অফিসের চারিদিকে একবার সে চোখ বুলিয়ে নেয়। না, চিন্তা করার বা কারো সঙ্গে পরামর্শ করার সময় নেই।

দু'চার মিনিট এদিক ওদিক হওয়ার উপরেই হয়তো কার্তিকের বাড়ি ফিরে গিয়ে পাঁচীকে জ্যান্ত অবস্থায় দেখা নির্ভর করছে।

কার্তিককে সে ডাকে না, নিজেই তার কাছে যায়। কার্তিক টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

: তোমাদের পাড়ায় দীনেশ চৌধুরী বলে কেউ থাকে ?

কার্তিক সায় দেওয়া মাত্র পা বাড়িয়ে অনিল বলে, আমার সঙ্গে এসো। তোমার বৌয়ের হঠাৎ কি যেন হয়েছে—টেলিফোনে খবর পেলাম।

মুখ পাংশু হয়ে যায় কার্তিকের।

: কি হয়েছে বাবু ?

: চল না দেখি গিয়ে।

কার্তিককে সঙ্গে নিয়ে অনিল সোজা গিয়ে খাস বড় সাহেবের দামী গাড়ীটাতে ওঠে, জোর দিয়ে হুকুমের সুরে ড্রাইভারকে বলে, জোরসে চালাও, সাহেবের হুকুম।

কোন্ দিকে যেতে হবে ড্রাইভারকে বলে দিয়ে অনিল জিজ্ঞাসা করে, পাঁচীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস ?

কার্তিক ভারি গলায় বলে, সকালে একচোট হয়ে গেছে।

: কি নিয়ে লাগল ?

: কাল থেকে মেজাজ গরম ছিল, বাড়িতে বকাবকি করেছিল। আজ ঘুম ভেঙেই বলে কিনা বাপের বাড়ি যাবে।

সাহেবের হুকুম ছাড়াই একজন বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে এসে গাড়ী দখল করে এমন জোরের সঙ্গে জোরসে চালাবার হুকুম কোন কেরাণী দিতে পারে, এটা কল্পনা করাও সাধ্য ছিল না ড্রাইভারের। সে জোরে গাড়ী চালিয়ে দেয়।

গলির মধ্যে খোলার বাড়িতে কার্তিকের বাসা। সে পর্যন্ত অবশ্য গাড়ীটা যেতে পারে না। তবে গলিটার মুখ পর্যন্ত যে সময়ের মধ্যে তারা পেঁছে যায়, সাহেবের গাড়ীটা দিয়ে ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে তা সম্ভব হত না, তাতে সন্দেহ নেই। গলির মধ্যে খানিক এগোলেই কার্তিকের খোলার বাড়ি।

বাড়ির সামনে গিয়ে একটু আশ্চর্য হতে হয়। বাড়িতে কোন গোলমাল নেই বরং বেশ যেন চুপচাপ। বাইরের দরজা পর্যন্ত ভিতর থেকে বন্ধ করা। হাসপাতালে নিয়ে গেছে? কিন্তু একটা বাড়ি থেকে একটি বিষ-খাওয়া বৌকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরেও এত তাড়াতাড়ি তো বাড়িটার এমন নিঝুম হয়ে যাবার কথা নয়!

কড়া নাড়তে একজন গেঞ্জি পরা বুড়ো মানুষ দরজা খোলে। কার্তিক ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে : কি হয়েছে দীনেশ বাবু?

দীনেশ শান্তভাবেই নীচু গলায় বলে, ভেতরে আয় না বাবা, সব শুনবি। ইনি কে?

অনিলের পরিচয় শুনে দরজা বন্ধ করতে করতে দীনেশ বলে, একটু গোপান রাখবেন ব্যাপারটা। গরীবকে ফ্যাসাদে ফেলবেন না। ডাক্তার এসেছে, বৌটাকে বাঁচানো যাবে।

শুনে কার্তিক যেন দেহে প্রাণ ফিরে পায়, অনিলও পরম স্বস্তি বোধ করে।

বাড়িতে কার্তিকেরা ছাড়াও আরও দু'টি পরিবার থাকে। বাইরে থেকে বুঝতে না পারলেও উঠানে পা দেওয়া মাত্র অনিল বাড়ির ভিতরের মানুষগুলির চাপা উত্তেজনা টের পায়। কতগুলি চাপা গলার গুঞ্জন চলছিল, তাদের দেখে হঠাৎ সেটা থেমে যায়।

পাঁচীকে শোয়ান হয়েছে ঘরের সামনে রোয়াকে, দীনেশের চেনা ডাক্তারের নির্দেশে চলেছে বিষের ক্রিয়ায় তার মরণ ঠেকাবার প্রক্রিয়া। মাথার কাছে যে রোগা কালো বিধবাটি বসেছিল, দেখে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় সে কার্তিকের মা। কথা বলার রকম থেকেও টের পাওয়া যায়।

: তোর বজ্জাত বৌটাকে নিয়ে আর তো পারি নে কার্তিক! হাড় মাস কালি করে দিলে। সোয়ামী শাউড়ী করলে বিষ খেয়ে শোধ নেবে—

দীনেশ কড়া সুরে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়ে বলে, থাক না এখন—ওসব কথা পরে হবে।

কার্তিকের মা চুপ হয়ে গিয়ে শুধু আঁচলে চোখ মোছে।

দীনেশ একটা সিগ্রেট ধরায়।

অনিলকে সে বলে, ঝোঁকের মাথায় বিষ খেয়েছিল, তারপর বিষের কাজ শুরু হতেই মরার ভয়ে হাউমাউ করতে লাগল। আমায় গিয়ে খবর দিতে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলাম, তারপর ফোন করলাম কার্তিকের অফিসে! বিপদে আপদে মানুষের মাথা কেমন বেঠিক হয়ে যায় দেখুন, ফোন করার পর খেয়াল হল বিষ খাওয়ার কথাটা ফাঁস করে দিয়েছি! বললেই হত বাড়িতে বিপদ—

অনিল বলে, না না, বলে বেশ করেছেন। বিষের কথা শুনেই একেবারে অফিসের গাড়ীতে তুলে ওকে নিয়ে এসেছি।

অফিসের গাড়ী !

এতক্ষণ যেন এদিকে খেয়াল ছিল না, এবার বুকটা ধড়াস করে ওঠে অনিলের। খোদ বড় সাহেবের গাড়ী। সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করেই এতদূরে ছুটিয়ে এনেছে। গলির মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে গাড়ীটা। কার্তিকের বৌ বিষ খেয়েছে শুনে তারও কি মাথা খারাপ হয়েছিল, সে-ও কি ঝোঁকের মাথায় বড় সাহেবের রোষের বিষ পান করল ?

এ বাজারে চাকরি যাওয়া আর সপরিবারে বিষ খাওয়ার মধ্যে তফাত কি '

কার্তিকের বৌ যখন মরবে না, এবার তার তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।

ডাক্তারকে সে জিজ্ঞাসা করে, বেঁচে যাবে, না ?

ডাক্তার বলে, হ্যাঁ! বাজে ভেজাল বিষ, একটু বেশি পরিমাণে খেয়েছে বলেই হাঙ্গামা। নইলে একবার বমি করিয়ে দিলেই চুকে যেত।

ঃ কার্তিক তুই থাক। আমি গেলাম।

অফিসে সে যখন ফিরল তখন চা-পানের বিরামটুকু প্রায় কাবার হয়ে এসেছে।

অনিলকে দেখা মাত্র সকলে কলরব করে তাকে ঘিরে ধরে, টের পাওয়া যায় সকলের কৌতূহল রীতিমত উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেছে।

সাহেব রেগে আগুন হয়ে গেছে, কানাই মুখুজ্যে ততোধিক। অনিল আর কার্তিক গট গট করে গিয়ে সাহেবের গাড়ীতে উঠল, গাড়ীটাও হুস্ করে বেরিয়ে গেল—এর বেশী কেউ কিছু বলতে পারছে না বলেই কানাই মুখুজ্যে চটেছে বেশী।

এমন একটা উদ্ভট ব্যাপার ঘটে গেল অফিসে আর সবাই বলছে আসল ব্যাপার কেউ কিছু জানে না !

দাবি-দাওয়া নিয়ে অফিসে কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে মনোমালিন্য যখন দানা বাঁধছে তখন এরকম ঘটনা ঘটা আর সকলের একজোট হয়ে অজ্ঞতার ভান করা—এর পিছনে নিশ্চয় খারাপ মতলব আছে, গুরুতর ষড়যন্ত্র আছে !

অনিল সব খুলে বলে, বলতে বলতে লক্ষ্য করে কানাই মুখুজ্যে সাহেবের খাস কামরা থেকে বেরিয়ে তার দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের খাস কামরায় চলে গেল।

সুধীর খানিকটা জানাতে পারত— অন্তত এটুকু খবর দিতে পারত যে টেলিফোনে কার্তিকের বৌয়ের বিষ খাওয়ার খবর পেয়েই অনিল কার্তিককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অল্প বয়স, ভয় পেয়ে সে একেবারে মুখ বুজে ছিল।

ব্যাপার শুনে সকলেই তারিফ করে অনিলকে। কয়েকজন তার পিঠ চাপড়ে দেয়।

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, কার্তিকের বৌটা বিষ খেল কেন ?

অনিল বলে, অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করিনি। ঝগড়াঝাটি হয়েছিল।

বিরাম খতম হয়। কাজ শুরু হয়। অনিলের ডাক পড়ে না। কার্তিক ফেরেনি কিন্তু সাহেবের গাড়ী আর অনিল ফিরেছে দেখে কি খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে কানাই

মুখুজ্যে ? সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠানোর বদলে ভেবে নিচ্ছে কিভাবে কি স্টেপ নেবে ?

প্রৌঢ় ধীরেনবাবু চাপা ধমকের সুরে বলে, চুপচাপ বসে আছ ? কী বুদ্ধি বলিহারি যাই ! কেন ডাকছে না, তাও বোঝ না ? চটে গেছে এটা দেখাতে চায় না, তাহলেই তো শাস্তি দিতে হবে। নিজে গিয়ে ব্যাপার বুঝিয়ে কৈফিয়ত দিয়ে এসো।

সুধীর সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিগ্‌গির যান। বড় হাঙ্গামার দায়, আলতো ব্যাপার নিয়ে এখন হাঙ্গামা করতে চায় না—তাই নিজে ডাকছে না। শেষ পর্যন্ত ডেকে কৈফিয়ৎ চাইতে হলে রক্ষা রাখবে না।

অনিল কানাই মুখুজ্যের কামরায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালে সুধীর বলে, সব খুলে বলবেন। আর বলবেন যে হঠাৎ বিষ খাওয়ার খবর পেয়ে মাথাটা কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল, কেন, কি করছেন খেয়াল ছিল না, —বুঝলেন তো ?

অনিল ধীরপদে কানাই মুখুজ্যের কামরায় যায়।

কানাই মুখুজ্যে রাগ দেখায় না। থমথমে মুখ দেখে টের পাওয়া যায় তার ভিতরের অবস্থা কিরকম দাঁড়িয়েছে। ভিতরে ক্রোধের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ যেন দমিয়ে রাখছে প্রাণপণ চেষ্টায়।

অনিল ভাবে, অন্য সময় অন্য অবস্থায় সে ফেরা মাত্র কিভাবেই না ফেটে পড়ত তার রাগ !

ঃ সংক্ষেপে বল।

ঃ সংক্ষেপেই বলছি স্যার।

অনিল কিন্তু বিস্তারিত ভাবেই ব্যাপারটা বলে। কানাই মুখুজ্যেও নীরবে মন দিয়ে তার বিবরণ শোনে।

সব শুনে বলে, সে তো বুঝলাম। কিন্তু কাউকে কিছু না জানিয়ে আমায় একবার জিজ্ঞাসা না করে, সাহেবের গাড়ী নিয়ে এভাবে চলে যাওয়া কি তোমার উচিত হয়েছিল ?

ঃ মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল স্যার। কার্তিকের বৌ ছেলেবেলা থেকে জানা, আমার বোনের মত। সে বিষ খেয়েছে শুনেই কার্তিককে নিয়ে পাগলের মত ছুটে গিয়েছি—কেন ওভাবে গিয়েছি, কি করেছি এখন ভাবতেও পারছি না স্যার।

কানাই মুখুজ্যে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, কার্তিকের বৌ তোমার কি হয় বললে ?

ঃ সম্পর্ক নেই, ছোটবোনের মত স্নেহ করি।

কানাই মুখুজ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

ঃ সবাই মিলে যদি এরকম পাগ্‌লামো শুরু কর, অফিস চালাব কি করে ? সাহেব তোমাকে তাড়াবেই, একেবারে ক্ষেপে গেছে। দেখি বুঝিয়ে শুনিয়ে চেষ্টা করে যদি এ যাত্রা—

অনিল চুপ করে থাকে।

আমি কিন্তু সাহেবকে বলব, তুমি খুব অনুগত, বরাবর ডিসিপ্লিন রেখে চল, কোন হাঙ্গামা হুজ্জুতে নিজেকে জড়াও না। আমায় মিথ্যাবাদী বানাবে না কিন্তু! আচ্ছা যাও।

গাড়ী উধাও হওয়ায়, হেঁটে চার পাঁচ মিনিটের পথ হোটেলটায় গিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে না পারায়, খাস কামরায় লাঞ্চ আনিয়ে খেতে হওয়ায়, রাগে দুঃখে অভিমানে জর্জরিত হয়ে পড়ায়, আজকেও আবার সাহেব নিয়ম ভঙ্গ করেছে। সন্ধ্যায় শুরু করার বদলে দুপুরবেলাই সিদ্ধ ডিমটা খেতে খেতে তিন পেগ খাঁটি স্কচ পেটে চালান করে দিয়েছে। রাগ দুঃখ অভিমানের জ্বালা তাই চাপা পড়ে গেছে অন্য একটা ভাবে। মুখটা লাল হয়ে গেছে কিন্তু সেটা এখন রাগের জন্য নয়। কানাই মুখুজ্যে আসতেই হাসিমুখে বলে, ইউ আর এ গ্রেট ম্যান নিয়োগী। কি কায়দায় অফিসটা চালাচ্ছ!

কানাই মুখুজ্যে ইংরাজীতে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি নিয়োগী নই স্যার, আমি মুখার্জি। নিয়োগীকে তাড়িয়ে দিয়ে আমায় বসালেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন!

কানাই মুখুজ্যেও হাসে।

ঃ আপনার গাড়ীর ব্যাপারটা বলতে এসেছি। আমাদের স্টাফের একজন খবর পায় সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তার ওয়াইফ নাকি সাংঘাতিক রকম আহত হয়েছে।

ঃ অ্যাক্সিডেন্ট! আমার গাড়ীর?

সাহেব আরেকটা পেগ মুখে ঢেলে দেয়।

ঃ গাড়ী ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে সামলে নিয়েছি। গাড়ীতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। স্টাফের একজনের ওয়াইফ—

ঃ ইউ আর এ গ্রেট ম্যান নিয়োগী!

নয়

ঠিক বকুল যেমন বলেছিল বিনয়কে, অবিকল তেমনি প্রতিক্রিয়া ঘটে তাদের পরিবারে। কে কিভাবে নেবে বিনয়ের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব।

প্রমোদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে। কে জানে স্বস্তির নিঃশ্বাস অথবা জীবনে আরও কত কিছু দেখতে হবে শুনতে হবে সইতে হবে ভেবে অসহায় মনোবেদনার নিঃশ্বাস।

বকুলের মা গুম খেয়ে ঠাকুর ঘরে ঢোকে।

পিসিমা আঁতকে উঠে কাতরাতে থাকে, বারবার মিনতি করে শুধু বলতে থাকে যে এবার তাকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হোক! আর নয়—এই ঘোর কলিতে আর সংসারে থাকা নয়—ইহকাল তো গেছেই, পরকালটাও যাবে এবার!

মুকুল একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে।

ঠিক পাগলিনীর মত করতে থাকে—হঠাৎ যেন বিশ্রীরকম হিস্টিরিয়ার প্রচণ্ড আক্রমণ ঘটেছে।

বিশ্রীরকম চেঁচামেচি শুরু করে, বকুলকে গালাগালি আর অভিশাপ দিয়ে সে আর কিছু রাখে না—তারপর আঁশ বটি নিয়ে বকুলের গলা কাটতে যায়।

ঃ বিয়ে করার সাধ গেছে ? আয় তোর গলা কেটে ফাঁসি দিয়ে দু'জনেই মিলে মিশে জ্বালা জুড়োই।

বকুল বিধবা হয়ে আসার পর থেকে বাড়িতে মাছ আসা বন্ধ ছিল অনেকদিন—তারপর ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল সপ্তাহে দু'দিন একবেলা পোয়াটেক মাছ আনা।

মর্চে ধরা ছোট বঁটির ভোঁতা ফলার কোপে গলা কেটে বোনকে মেরে ফেলতে পারত কি না সন্দেহ তবে তার উন্মত্ততার ভারে ওই ফলার ঘায়েই বকুল জখম হত নিশ্চয় !

অনিল বাড়ি না থাকলে সবাই শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচিই করত—মুকুলকে ঠেকাবার জন্য কারো হাত পা উঠত না, আতঙ্কের পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যেত।

এসব অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে শক্ত না হলে সর্বনাশ হয়ে যায় এটা অনিলের জানা ছিল—কিন্তু রাগও কি তার হয়নি ?

অন্য কোন উপায় অবশ্য ছিল না।

আচমকা বঁটি উঁচিয়ে পাগলিনীর মত এমনভাবে মুকুল ছুটেছিল যে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধরে ঠেকাবার চেষ্টা করলে বকুলের গলায় বঁটির কোপ পড়া ঠেকানো যেত না।

নিরুপায় হয়েই অগত্যা বসা অবস্থাতেই পা বাড়িয়ে যুযুৎসুর প্যাঁচ কষে মুকুলকে আছড়ে ফেলে দিতে হয়।

বঁটিটা ছিটকে যায় বারান্দার অন্য কোণে, মুকুল আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে। ছড়ে যাওয়া কনুই, কেটে যাওয়া থুতনি আর ছেঁচা নাক থেকে রক্ত ঝরতে থাকে মুকুলের।

দু'হাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বকুল হু হু করে কেঁদে ওঠে।

সকলে চেঁচায়।

শুধু মুখ খোলে না অনিল।

প্রথমে নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়া বন্ধ করে আইডিন লাগিয়ে মলম দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা শুরু করতে গেলে মুকুল ঠেকাবার চেষ্টা করলে একটিবার শুধু সে বজ্র গর্জনে ফেটে পড়ে একটা ধমক দেয়।

চেঁচামেচি কমে যায়।

মুকুল গুম খেয়ে যায়।

বকুল গিয়ে বলার আগেই অবশ্য বিনয় ব্যাপার সব শুনতে পায়।

বকুলের কাছেও আগাগোড়া সব সে আবার শোনে।

বলতে বলতে বকুল কাঁদে।

চোখ মুছতে মুছতে কেসে কেসে বন্ধ গলা সাফ করে নেয়।

বিনয় কথা বলে না।

সস্তা প্রেমিকের মত পরনের দামী লুঙ্গির খুটে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার চেষ্টাও করে না।

কিছুক্ষণ পরে কান্না থামিয়ে কাতর ভাবে এই বলে বকুল তার বর্ণনা শেষ করে : থাকগে কাজ নেই। এমন বিশ্রী লাগছে আমার। সকলের খ্যাচ-খেচানিতে এ রকম বিশ্রী লাগবে আর সারা জীবন তোমায় জ্বালাব—থাকগে, কাজ নেই।

বিনয় শান্ত সুরে বলে, অনিল একটা বোনকে সামলেছে—তোমাকে সামলানোর জন্য একটা চড় মেরে গাল ফাটিয়ে দেব কিনা ভাবছি।

বড় বড় চোখে বকুল চেয়ে থাকে।

: গাল কেন ফাটিয়ে দিলাম না জানো? ওই গালেই সারাজীবন আমায় চুমো খেতে হবে বলে।

মাথা হেঁট করে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ থেকে বকুল মৃদুস্বরে বলে, মিছে কথা বললে। মন ভোলাতে বললে। শিশু আর মেয়ে বোনের গালে লোকে চুমু দেয়—বৌয়ের গালে দ্যায় নাকি?

বকুলের মাথায় হাত রেখে বিনয় বলে, কেন ভাবছ? আমি তোমায় সুখী করব বকুল।

: আমার মনটাই যে বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি আমি সুখী হব—জগৎ সংসার যেন পিছনে লেগেছে আমাদের। আমার যে কী ভয় করছে, কত ভাবনা হচ্ছে তুমি তা বুঝবে না!

বুঝিয়ে শুনিয়ে সামলে সুমলে বকুলকে সে বাড়িতে ফেরত পাঠায় কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে শুনে হিসাব-নিকাশ করতে বসে বিনয়ের বিশ্রী রকম একটা হতাশা জাগে।

আরও অনেক বছর বয়স না বাড়লে, আরও অনেক অভিজ্ঞতার শিক্ষা সঞ্চয় না করলে, জীবনের সেরা বছরগুলি জানতে বুঝতে ব্যয় না করলে, তার পক্ষে বোঝাই সম্ভব নয় যে বকুলকে বিয়ে করে বকুলকে সুখী করতে পারবে কিনা, নিজে সুখী হতে পারবে কিনা।

কেন?

কেন এই অনিয়ম?

জীবন্ত মানুষের পক্ষে জীবন-বিরোধী নিয়ম?

বকুল আসে না।

গিয়ে বকুলের সঙ্গে দেখা করে কথা বলারও উপায় নেই!

তার পক্ষ থেকে প্রস্তাব গিয়েছে, বকুলকে সে বিয়ে করবে।

বিয়ের আগে তার যাওয়া চলে না ও বাড়িতে, আর কথা বলা চলে না বকুলের সাথে।

বকুল এক ফাঁকে এসে তার সঙ্গে কথা বলে যেতে পারে, অন্যের কাছে অশোভন হলেও সেটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

অনিলের সঙ্গে দেখা হয় মাছের বাজারে। সপ্তাহে দু'তিন দিন একবেলা তারা মাছ খেত, মাসে একদিন মাংস। বকুল আসার পর মাছের পাট তুলে দেওয়া হয়েছিল।

আজকাল অনিল আবার মাছ কিনছে।

অনিল জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাকি সর্দি হয়েছিল ?

ঃ সামান্য ব্যাপার, সেরে গেছে। মাছ খাওয়া আবার শুরু করছো নাকি আজকাল ?

ঃ কেন খাব না ? বকুলকে আনার পর বাড়িতে মাছ আনলেই মা কান্না জুড়ত— তাই কিছুদিন বন্ধ ছিল। একদিকে ভালই হয়েছিল—একটা খরচ বেঁচেছিল। চাকরিটা পেয়েছি, একটু মাছ-টাছ খাব না একবেলা ? বকুলকেও বুঝিয়ে ধমক দিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা করছি—একেবারে কথা শোনে না। কিভাবে শিকড় গেড়েই যে সংস্কার থাকে মানুষের মনে !

কেবল ব্যক্তিগত খেদ প্রকাশ করছে না, অনিল সাধারণ ভাবে আপসোস প্রকাশ করছে, সকল মনের হিসাব ধরে। বকুল যখন আসল ব্যাপারে রাজী হয়েছে, এখনো ছোটখাট খুঁটিনাটি সংস্কারের জের টানার জন্য তার উপর বিরাগ জন্মায়নি অনিলের।

ঃ কি বলে জানো ? খাবই তো, দু'দিন পরে খাব। তার মানে হল, বিয়েটা চুকে গেলে তারপর খাব। তখন আর বাধা থাকবে না।

অনিল একটু খেদের হাসি হাসে।

ঃ এখনো ওর মনে যে কি তোলপাড়টাই চলছে! বিয়েটাকে মানতে পেরেছে, আর কিছুই মানতে পারছে না।

বিনয় বলে, বিয়ের পর মন-টন বিগড়ে যাবে না তো ? মানাতে না পেরে অসুখী হবে না তো ?

অনিল হেসে বলে, পাগল হয়েছ ? ছেলেমানুষ বুঝতে পারছে না, একটা ভাবের জাবর কাটছে। আরেকটু পাকাপোক্ত মেয়ে হলে এটুকুও ঘটত না। এসব কখনো থাকে ? দু'দিনে এসব ভাবনা কোথায় মিলিয়ে যাবে।

একটু থেমে সংশয় মেশানো বিস্ময়ের সুরে অনিল জিজ্ঞাসা করে, তোমার ভাবনা হচ্ছে নাকি ? গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে ঝন্‌ঝাটে পড়বে ভেবে ভয় হচ্ছে ?

বিনয় বলে, না অনিলদা, ঝন্‌ঝাটের ভয় নয়। আমি ওর কথা ভাবছিলাম, খুঁত-খুঁতানি যদি না কাটে !

অনিল বলে, তার মানেই তো ভয় পেয়েছ। কিছু ভেবো না। ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি জীইয়ে রাখারও চেষ্টা কর তবু ওর খুঁতখুঁতানি কেটে যাবে। ওর মনের একটা গড়ন আছে, সেটা ভাঙবারও দরকার হবে না। তুমি নতুন যেরকম

গড়ন দিতে চাও সেইভাবেই গড়ে নিতে পারবে—সহজেই পারবে। এদিকটা নিয়ে চিন্তা করো না।

অনিল একটু থেমে বলে, ওর মধ্যে অনেক রকম সংস্কার আছে—একটা বড় সংস্কার তোমার খুব কাজে লাগবে। ও জানে স্বামী হল দেবতা, স্বামীর ইচ্ছা মেনে চলার জন্যই ওর জন্ম। যে তোলপাড়টা চলছে ওর মধ্যে তার কারণও এই, স্বামী নামক যে মালিক দেবতা মরে গেছে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না তো! বিয়ের পরদিন থেকে তোমাকে দেবতা মনে করবে, দেহ মনের মালিক মনে করবে। ভগবানের চেয়েও তুমি হয়ে যাবে বড়।

মাছের বাজারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল--অবশ্য এক কোণে সরে দাঁড়িয়ে। মাছের বাজার বলেই শুধু নয়, আলাপ বন্ধ করে অনিলকে এবার বাড়ি ফিরতেই হবে, খেয়ে দেয়ে অফিস যাওয়ার তাগিদ আছে।

তবু অনিলের হাত ধরে থামিয়ে বিনয় একটা প্রশ্ন করে, তুমি ওকে কেন কিছুই শেখাও নি অনিলদা? একেবারে স্রোতে ভেসে যেতে দিয়েছ কেন?

অনিল বলে, আমিও আজকাল ওই কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছি ভাই। আমার নিজের লড়াই কঠিন, তাই কি গা বাঁচিয়ে চলেছি? ঝন্‌ঝাট এড়িয়ে গিয়েছি?

শান্তভাবে সে একটু হাসে।

: ছেলেবেলা থেকে আমিও ওই বাড়িতেই মানুষ হয়েছি - সেটা কিন্তু ভুলো না। বকুল মেয়ে, আমি ছেলে কিন্তু বকুলের বয়সে ওর সঙ্গে আমার শুধু তফাত ছিল এই-টুকু যে—বাইরে বেরোতাম, স্কুলে যেতাম, পাঁচজনের সঙ্গে মিশতাম।

বিনয় প্রায় সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে, মুকুলদি কি বলছে?

ঃ মুকুল?

অনিল একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

ঃ ও কিছুতেই ওর গো ছাড়বে না—পাগলী তো! বকুলকে শাসিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। দত্তবাড়ির কুনাল, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে,—বেচারার পরীক্ষা আসছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। যাকগে, ভালই করেছে একরকম, পরীক্ষার তাড়ায় ও ফিরবার জন্য জন্য পাগল হবে—দু'চার দিনের মধ্যে ফিরতেই হবে ওকে নিয়ে। একলা গেলে বড় ভাবনা হত।

কুনাল ফিরে আসে দিন তিনেক বাদেই।

তার কাছে খবর পাওয়া যায় যে বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে মুকুল সোজা হাজির হয়েছিল বকুলের শ্বশুরবাড়ি।

সেখানে দু'দিন কাটিয়ে সে নিজের শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

বকুলের শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথাটা তাদের জানাতে কুনালকে মুকুল বারণ করে-ছিল—কিন্তু লুকোচুরি কুনালের বিশ্রী লাগে, তাই সে সব ফাঁস করে দিল।

বকুলের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

অন্য সকলে গম্ভীর মুখে চুপচাপ থাকে। মুকুলের এই খাপছাড়া কাণ্ডের তাৎপর্য বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

বকুলের বিয়ের খবরটা সে তার শ্বশুরবাড়িতে নিজেই জানিয়ে দিতে গিয়েছিল কর্তব্য করা, আর কিছু নয়। তার বোনকে দিয়ে একটা বিশ্রী পাপ করাবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা ঠেকাবার জন্য একটু চেষ্টা না করলে কি চলে!

একটু দ্বিধা ভয় হয়তো তার ছিল, অনিলের শাসনের ফলে প্রাণের জ্বালায় সেটুকুও জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

অনিল বকুলকে বলে, তোর ভাবনা কিসের? আমরা কি লুকিয়ে কিছু করছি? বে-আইনী কিছু করছি? আমরা নিজেরাই তো যথা সময়ে ওদের জানাতাম।

বকুল কাতরভাবে বলে, আমার কেমন বিশ্রী লাগছে!

অনিল তার মনের ভাব বুঝতে পারে। তার নিজেরও খুব বিশ্রী লাগে। কিন্তু সে ভাবটা চেপে গিয়ে সে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, মাথা ঠাণ্ডা কর। বুঝবার চেষ্টা কর কেন তোর বিশ্রী লাগছে। বিশ্রী তোর লাগত না, অন্য সবাই মিলে বিশ্রী লাগাচ্ছে।

বকুলের জবাব অনিলকে আশ্চর্য করে দেয়। বকুল বলে, তা তো জানি। আমার মনের খটকা তো কেটেই গিয়েছে। কিন্তু সবাইকে বাদ দিয়ে কিছু করা কি ভাল হবে?

অনিল বলে, সবাইকে বাদ দিয়ে? আমরা যা কিছু করছি সবাইকে নিয়েই করছি। দু'চারজন হিংসুটে বাজে মানুষ সব ভাল কাজেই এরকম ফ্যাসাদ বাধাতে চেষ্টা করে। সেইজন্য ভাবনা করতে নেই।

কিন্তু অনিল মনে স্বস্তি পায় না। নিজের ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে সে আপন মনে নানা কথা ভাবে।

বকুলের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে বটে কিন্তু বার বার উমা এসে তার চিন্তা জগতে উঁকি দিয়ে যায়।

প্রশ্ন জাগে, সংস্কার কি উমারও নেই?

যত বড় বিশ্বাসঘাতকতাই অজিত করে থাক, রাগ দুঃখ অপমানে প্রাণটা যতই পুড়ে যেতে থাক, ভালবাসার সেই চিরন্তন সংস্কারটা উমাও আঁকড়ে ধরে আছে—ভালবাসা নিয়ে অজিতেরা খেলা করতে পারে, হিসাব কষা সস্তা ইয়ার্কিটা পৌরুষের মস্ত জয় আর বাহাদুরি ভাবতে পারে কিন্তু মেয়েরা ভালবাসলেই ভালই বাসে, তার মধ্যে ফাঁকির কারবার রাখে না।

কলেজে পড়া পাকা-পোক্ত চালাক চতুর মেয়ে উমা, সে কি আর জানে না যে অবস্থার চাপে পড়ে অযথা আরাম বিলাস সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে অনেক মেয়ে ভালবাসার ভানও করে, পুরুষের কাছে ধরাও দেয়।

কিন্তু সে হল অন্য হিসাব।

ভালবাসার হিসাব নয়।

অজিতকে সে ভালবেসেছিল, ভালবেসেছিল বলেই বিশ্বাসও করেছিল।

অজিতের সম্পর্কে উমার অবশ্য আর কোন মোহ ছিল না। অজিত এসে পায়ে ধরে সাধলেও সে বোধহয় তার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখতে রাজী হত না।

কিন্তু মানুষের মনের ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার রীতিনীতিই এক অদ্ভুত ব্যাপার। নইলে মন নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে সারাজীবন গবেষণা চালিয়ে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা কি এরকম হিমসিম খেয়ে যেত—এতরকম থিয়োরী চালু হত মনের ব্যাপার নিয়ে?

হঠাৎ একদিন ডাকে অজিতের একটি পত্র আসে। রেজিস্ট্রি করা পত্র—অ্যাক্‌নলেজ-মেন্ট ডিউ।

অজিত নাকি বিয়ে করবে!

কৈফিয়ত দেয় নি, উমাকে একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে যে এতে কোন দোষ নেই।

জীবনের আর দশটা প্রয়োজনের মতই এও শুধু প্রয়োজন মেটানো। মিথ্যা রাগ-অভিমানের বশে উমা আরও পড়ার, নিজের উন্নতি করার সুযোগ ত্যাগ করেছে—এটা ভুল। তবু, সংসারে সাধারণভাবে জীবনে সুখী হবার পথে উমার কোন বাধা নেই, সেও ইচ্ছা করলে তার পছন্দমত একজনকে বিয়ে করতে পারে। তাতে কোন অপরাধ হবে না—প্রেমের দেবতার কাছেও নয়।

বেঁচে থাকা এক ব্যাপার—ভালবাসা অন্য ব্যাপার। ভালবাসা দুর্লভ—জুটল না বলে বৈরাগ্যের মানে হয় না।

উমার কাছে অদ্ভুত মনে হয় চিঠি লিখবার ধরণটা। বোঝা যায়, অনেক মুসাবিদা করে অজিত চিঠিখানা দাঁড় করিয়েছে। কায়দা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোন আভাসে-ইঙ্গিতে নিজের বক্তব্যটা সে বোধগম্য করার চেষ্টা করেছে উমার কাছে।

অন্য লোকে পড়লে কিছুই বুঝবে না এ চিঠির মানে।

পড়ে তাদের মনে হবে, ঠিক যেন বিভ্রান্ত কোন কুমারী আত্মীয়াকে কিছু উপদেশ দিয়েছে।

বার তিনেক চিঠিখানা পড়ে হঠাৎ উমার চোখ খুলে যায়। তাই বটে, ঠিক!

সযত্নে আইন বাঁচিয়ে মুসাবিদা করা চিঠি—কোনদিন কোন কারণে রাগ বা প্রতি-হিংসার জেদের বশে মরিয়া হয়ে উঠলেও উমা যাতে এই চিঠির অস্ত্র দিয়ে তাকে জব্দ করতে না পারে!

কত হিসাব অজিতের!

উমা তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক খোলে, অজিতের পুরোনো চিঠিগুলি বার করে প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করে পড়ে।

তাই বটে, ঠিক!

প্রত্যেকটি মানসিক ভালবাসার প্রেমপত্র!

কোন চিঠিতে এমন একটা উল্লেখ নেই, ইঙ্গিত নেই, শব্দ নেই—যা থেকে কল্পনা করা চলে তাদের শুধু মানসিক ভালবাসা ছিল না!

একটা পর্দা যেন সরে যায় উমার চোখের সামনে থেকে।

এবার সে বুঝতে পারে আসল ব্যাপার।

কপটতা নয়। ছলনা নয়।

প্ল্যান করে তার সঙ্গে খেলা করে সরে যাওয়া নয়।

যে সংসারে মানুষ হয়েছে তাতে সাংসারিক মোটা হিসাব-নিকাশ, দাম কষাকষির আদান-প্রদান একেবারে চেতনায় রপ্ত করতে হয়েছে বৈকি অজিতকে!

এই বয়সে বড় গদ্যময় নীরস দরাদরির জীবন অজিতের।

পার্থিব প্রেমে তার তাই রুচি নেই। মনে-প্রাণে চেয়েছে স্বপ্নের প্রেম—মানসিক প্রেম।

এই প্রেমের আকাশ তৃষ্ণা মেটাতে পারে নি বলে সে আহত সম্রাটের মত তাকে আর তার পার্থিব বাস্তব প্রেমকে ত্যাগ করে সরে গিয়েছে—জীবন থেকে ভালবাসাবাসির ব্যাপার বাতিল করে দিয়েছে এইজন্য যে, তার মর্মান্তিক সাধকে উপেক্ষা করে জীবন-নদীর স্রোত উল্টো দিকে চলতে রাজী হয় নি।

উমাকে ভাবতে হয় না মুসাবিদা করতে হয় না। সংসারের হিসাবের খাতার একটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সে অজিতের চিঠির জবাব লেখে ঃ

মন গড়া বাজে কথা ভেবে বিব্রত বোধ করো না শান্ত মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ে কর।

ভুল করা পাপ নয়।

ভুল করে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় সত্যিই – আগুন ভুলকে খাতির করে না। কিন্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার নামে মলম লাগিয়ে ফোস্কা সারাবার বদলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোড়া ঘা-টা দগদগে করে তোলাও মস্ত ভুল।

ভুল তুমি একা করনি।

আমিও ভুল করেছি।

আগেরবার তুমি বলেছিলে, ভালবাসা ফাঁকি, ভালবাসা বলে কিছু নেই। এবার তুমিই আবার লিখেছ, ভালবাসা দুর্লভ, না জুটলে বৈরাগ্য অবলম্বনের কোন মানে হয় না।

তুমি যে ভালবাসা চাও, সে ভালবাসা তোমার মনের বিকারেই শুধু আছে, এ জগতে পাওয়া যায় না।

আমি যে ভালবাসায় বিশ্বাস করি সেটা মোটেই দুর্লভ নয়। ভালবাসা ওরকম দুর্লভ হয়ে গেলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব কিছুকালের মধ্যেই লোপ পাবে—যে ক'টা বাচ্চা কাচ্চা ইতিমধ্যে জন্মেছে সেগুলি মরবার সঙ্গে!

আমি তোমার বিয়ে দেখতে যাব—ফুর্তি করে আসব।

প্রথমে ইতি লিখে শুধু নামটা সই করেছিল—উমা।

হঠাৎ খেয়াল হয় যে দু'তিনটি শব্দ খাটিয়ে সেও তো কায়দা করে ইঙ্গিতে মনের ভাব জানিয়ে দিতে পারে অজিতকে।

'ইতি' শব্দটির নীচে লিখেছে 'উমা'। মাঝখানে ফাঁক আছে। সেই ফাঁকে সে লিখে দেয়, 'সারা জীবনের জন্য তোমার যে কেউ নয় সেই—উমা।'

উমার হিংসা হয় না।

সে কিছুমাত্র জ্বালা বোধ করে না।

প্রাণে বরং সে স্বস্তি বোধ করে।

অজিতকে সে সত্যই ভালবেসেছিল, মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল।

আজ তার মনে হয়, এই মানুষটার সাথে সারাজীবন অসীম যন্ত্রণা ভোগ করার হাত থেকে যে রেহাই পেয়েছে সেটাই তার পরম ভাগ্য।

বিষাদ জাগে।

কিন্তু সে বিষাদে জ্বালা-যন্ত্রণার ঝাঁঝ থাকে না।

প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয় ?

মানুষ কেন জীবনকে এমন সস্তা করে দেয় ?

এগারো

কান্তার বিষয়ে বলতে গিয়ে তার অতীত জীবনের একটা গুরুত্বের কথা উল্লেখও করা হয় নি।

এত অল্প বয়সের সে ঘটনা, পরবর্তী জীবনে এমনভাবে চাপা পড়ে গিয়েছে ব্যাপারটা যে এখন পর্যন্ত সাধারণ একটা সূত্রও পাওয়া যায় নি যা অবলম্বন করে সেটা টেনে আনা যায়।

মেয়ে পুরুষ সবার জীবন আরম্ভ হয় আঁতুড়ে। তারপর শৈশব কাটাতে হয়। তারপর আবার কৈশোরের পালা। তবেই যৌবনে পদার্পণ করা যায়।

সবার জীবনে না হোক, কারো কারো জীবনে কত ওলোট পালোট যে ঘটে যায় এই সময়ের মধ্যে। জীবনের গতিধারা এমনভাবে দিক পরিবর্তন করে, নূতন পথ ও পরিবেশের মধ্যে নূতন রূপ নিয়ে এমনভাবে এগিয়ে চলে যে অতীতের সঙ্গে সম্পর্কের সাধারণ চিহ্নগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাত আট বছর বয়সে কান্তার বিবাহ পর্ব মহাসমারোহে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল।

সেটা অবশ্য তার ঠাকুরদাদার কীর্তি।

অনেক পয়সা খরচ করে ঘটা করে নাতনির বিয়ে দিয়ে বেচারা তিন মাসও বাঁচে নি।

ডবল নিমুনিয়ায় কাত হয়েছিল।

বিয়েটা বাতিল বলেই বরাবর গণ্য করে এসেছে কান্তা।

যত পারে আদায় করে নিয়েছিল অঘোর !

অনেক কিছু আদায় করে সে নাকি বড়লোকের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘরসংসার করছে।

করুক।

কান্তা ধার ধারে না।

স্বামীর ঘর করার সুযোগ যে পায়নি সে জন্য কান্তাকে কেউ একদিন এক মুহূর্তের জন্য বিমর্ষ হতে দেখে নি, কোনদিন তার মুখে একটি আপসোসের কথা শোনে নি।

যেন ভালই হয়েছে এইভাবে সে কলেজের পড়া চালিয়ে গেছে—এখনো তেমনি সতেজে নিজের চেষ্টায় কিছু রোজগার করে নিজের খরচটা চালিয়ে যাচ্ছে।

নিজের খাই-খরচার হিসাবে সে সংসারের ভাণ্ডারে কিছু টাকা প্রতিমাসে জমা দেয়।

হঠাৎ দরকায় পড়লে এবং দরকারটা কান্তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলে সংসারের দু'পাঁচটা বাড়তি প্রয়োজনও সে মিটিয়ে দেয়।

তার সম্বল টিউশনি।

সকালে দু'বাড়িতে তিন আর চার মিলিয়ে সাতটি ছোট ছেলেমেয়েকে স্কুলের নীচু ক্লাসের পড়ায় তালিম দেয়—সাড়ে ছ'টায় শুরু করে বেলা দশটা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় বাড়ির মেয়েদের স্কুল বসে এগারটায়। তারা দশটা পর্যন্ত তালিম নিতে পারে।

সন্ধ্যায় পড়ায় উঁচু ক্লাসের বড় মেয়ে সূর্যমুখীকে।

সূর্যমুখী কি করে ক্লাশ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষার ক্লাশে উঠেছে কান্তা সেটা কল্পনা করতে পারত না।

সূর্যমুখীর বাবা কমলবাবু একদিন খোলাখুলি ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ঃ মেয়ে চাকরি বাকরি করে সংসার চালাবে, ভবিষ্যতে একদিন আমাকে খেতে পরতে দেবে, সেজন্য তো পড়াচ্ছি না। আজকাল ছেলেরা পাস করা মেয়ে চায়।

ঃ কিন্তু মেয়ে যে আপনার বড় বেশী কাঁচা। শেষ পরীক্ষায় পারবে না।

ঃ শেষ পরীক্ষার আগেই ওর বিয়ে দিয়ে দেব। ছেলে ভাল—তিন শ' টাকা মাইনে পায়। পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে যাবে, পাস ফেলে আসবে যাবে না।

সূর্যমুখীর যথাসময়ে বিয়ে হয়েছিল এবং যথা নিয়মে সে শেষ পরীক্ষায় ফেলও করেছিল।

কয়েক মাস বন্ধ থাকলেও এই মোটা বেতনের টিউশনির কাজ কিন্তু কান্তার যায় নি।

সে এখন সূর্যমুখীকে তার স্বামীর বাড়িতে পড়ায়।

স্কুলে আর যায় না সূর্যমুখী, ঘরেই পড়ে।

প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে।

একটু দূরে হয়—যাতায়াতে ট্রাম-বাসের খরচা লাগে, সময়ও বেশী খরচ হয়।

সেটা পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সূর্যমুখীর স্বামী মোটা সোটা সুকুমার অনেকগুলি পরীক্ষা পাস করে ইঁট সুরকি চুন বালি সিমেন্টের কারবারে জড়িয়ে পড়েছিল।

আয় মন্দ নয়।

কিন্তু কাজটা বিশ্রী।

কর্তাদের মোটা লাভের ব্যবসায় সাহায্য করে সে লাভের একটা ভগ্নাংশ বখরা পায়।

তার বড় সাধ যে তার বৌ অন্তত স্কুল ডিঙ্গানোর পরীক্ষায় পাস করবে তার মান বাড়াবে।

পড়াতে পড়াতে কান্তা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, ফেল করলে কি হবে?

সূর্যমুখী হেসে বলেছিল, কি আর হবে? ফেল করার জন্য আমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে জেনে সিনেমা দেখাবে, বেড়াতে নিয়ে যাবে···

তার সহজ সরল আত্মবিশ্বাস দেখে কত কথাই যে কান্তার মনে হয়েছিল!

কান্তাই স্বামীকে ত্যাগ করেছিল।

অঘোর বড় বেশি মদ খেত, রেস খেলে টাকা উড়িয়ে দিত, আজ চুড়ি কাল কানপাশা চেয়ে নিয়ে টাকায় মাসে দু'পয়সা সুদে বাঁধা দিয়ে বিপদ সামলাত— কিন্তু সেটাই শেষ কথা ছিল না।

মাঝে মাঝে অকারণে ঝগড়া করে কান্তাকে সে মারত।

মাতালের মার বড় বিশ্রী।

জ্ঞানশূন্য হয়ে মারে।

একদিন কান্তা দিশে হারিয়েছিল।

দু'হাতে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অঘোরকে ঠেলে দিয়েছিল। এমনিতেই অঘোরের তখন টলটলায়মান অবস্থা—ওই ধাক্কা কি সে সামলাতে পারে?

তাদেরই বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক পাওয়া বড় ট্রাঙ্কটার কোণে লেগে ভেঙ্গে গিয়েছিল তার নাকের হাড়, তারপর মেঝেতে আছড়ে পড়ে ফেটে গিয়েছিল মাথা।

কান্তাই ডেকে এনেছিল সকলকে।

সকলে ভেবেছিল নেশার ঝোঁকে পড়ে গিয়ে বুঝি অঘোরের ওইরকম অবস্থা হয়েছে।

রক্তপাতের দরুণ কতগুলি বিশেষ উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে সেই রাত্রেই অঘোরকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল।

পরদিন সকলের আপত্তি উপেক্ষা করে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে কান্তা বাপের বাড়ি ফিরেছিল।

বলেছিল, ভাবছেন কেন, হাসপাতালে গেছে, ভালই হয়েছে। আপনারা কেউ ডাকান না— বাবাকে দিয়ে ওনার মদ খাওয়ার রোগটাও এই সুযোগে সারিয়ে দেব।

দেখে শুনে সকলে থ' বনে গিয়েছিল।

ছেলেমানুষ বৌয়ের মুখে এমন তেজী স্পষ্ট কথা, এমন তার সতেজ আস্ফালন।

শুধু কথায় নয় কাজেও সত্যিই সেটা করতে চলেছে।

কারো অনুমতি না নিয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত করে বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি রওনা দিচ্ছে।

সঙ্গে কেউ গেলে যাবে।

না গেলে দরকার নেই। সে একাই চলে যাবে।

গায়ের জোরে হয়তো তাকে সাময়িকভাবে আটকানো যেত—কিন্তু কেউ সাহস পায় নি।

নিজের সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে কান্তা ছোট দেওরের হেফাজতে বাপের বাড়ি বিদায় নিয়েছিল।

শেষ বিদায়।

হাসপাতাল থেকে ফিরে অঘোরও তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি, কোন সম্পর্কই রাখে নি।

এমন তেজী রাগী বৌ তার সইবে না। রেহাই পেয়ে বেঁচেছে।

বাড়ি ফিরেই কান্তা স্নান করে কুমারীর বেশ ধরেছিল। আজও তার সেই কুমারীর বেশ।

বিয়েতে পাওয়া গয়না বেচে, আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য নিয়ে, টিউশানি করে সে নিজের পড়া চালিয়ে এসেছে।

মধ্যবিত্ত সংসারের সাধারণ একটি মেয়ের এইরকম অবস্থায় এই লড়াই চালিয়ে যাওয়া যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, অনিল ছাড়া আর কেউ বোধহয় তা ঠিকমত ধারণাও করতে পারে নি।

কতগুলি বছর যে কেটে গেছে তারপর!

গ্রীষ্মের বন্ধ শুরু হয়েছিল।

কান্তা কয়েকদিন ছুটি নিয়েছিল।

একদিন খবর আসে অঘোর মারা গেছে।

টি. বি. হয়েছিল।

কান্তা অনিলকে মিষ্টি সুরে অনুরোধ জানায়, জেনে এসো তো সত্যি মরেছে কিনা?

অনিল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে, সত্যি জেনে আসতে যাব?

কান্তা বলে, খবরটা জেনে এলে আমি নিশ্চিন্ত হব। সত্যি সত্যি মরলে তবেই তো আমার মুক্তি। কোনরকম সম্পর্ক নেই—তবু কত বছর বৌ হিসাবে বাধা হয়ে আছি। এ সুদ কষতে কত দাম দিতে হয় হিসেব রাখো।

ঃ রাখি।

ঃ আজ মিছে কথা বলো না, ছলনা করো না।

ঃ সত্যি কথাই বলছি। এমনি মরে গেছে - তারপর আর কথা নেই। তুমি বললেই ওকে খুন করে আমি ফাঁসি যেতাম।

কান্তা রেগে যায়।

কিন্তু নিচু গলাতেই বলে, ছি, এসব ছেলেমানুষী কথা কি তোমার মুখে শোভা পায়? তোমায় খবরটা জেনে আসতে বলেই বোধহয় ভুল করেছি। থাকগে, কাজ নেই।

অনিল শান্ত সুরে বলে, খবর জেনে আসতে যাবার দরকার হবে না। আমি খবর জানি। আমার একজন বন্ধু ওকে পোড়াতে গেছে। আমায় ডেকেছিল—আমি রাজী হইনি!

কান্তা বলে, ও!

শীত কেটে যায়।

তারপর একদিন ছুটির দিনে কান্তা নিজেই অনিলের কাছে যায়।

অনিলের কাছে যাওয়ার আগে অনেকদিন পরে আজ কান্তা সাধারণ প্রসাধনটা একটু যত্ন নিয়ে সারে।

সাধারণ ভাল শাড়ীটা একটু ভালভাবে পরে।

অনিলের নাগাল ধরে বলে, চল না সিনেমায় যাই দু'জনে মিলে?

অনিল যেন আকাশ থেকে পড়ে।

ঃ সিনেমায়? দু'জনে?

ঃ বা ঃ! এই সেদিন না দু'জনে সিনেমায় যাওয়ার কথা বলেছিলে? যাব না বলতে মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল?

ন্যায়সঙ্গতভাবে তার প্রাপ্য ভালবাসা কান্তা বরাবর অস্বীকার করে এসেছে। তার একটা অমানুষ মাতাল স্বামী—যার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, কোনদিন কোনরকম সম্পর্ক গড়ে উঠবার সম্ভাবনাও নেই—সে শুধু জীবিত আছে এই গ্রাম্য কুসংস্কারের খাতিরে।

চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে গিয়েছিল তাদের জীবন—কুশল জিজ্ঞাসা করে একখানা চিঠি লেখার বালাই পর্যন্ত ছিল না।

অঘোর ওদিকে মদ মেয়েমানুষ রেসখেলা জুয়াখেলায় মেতে ফুর্তি করছে—তারই খাতিরে কান্তার মত একেলে শিক্ষিতা মেয়ে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবাসার আনন্দবেদনা বর্জন করে এসেছে।

এজন্য কান্তার উপর যতই রাগ হোক—তার উপর সে যে বিন্দুমাত্র বিরাগ বোধ করে না, এটা দেখাতে কতবার অনিল যে যেচে যেচে তার কাছে গিয়েছে নানা ছুতোয়, তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে নানাভাবে।

ভাল লাগা একটি মেয়ের সঙ্গে ভদ্রভাবে মিলেমিশে, দীর্ঘ দিন ধরে পরস্পরকে জানা-বোঝার ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে নিজের মধ্যে মেয়েটির জন্য আর মেয়েটির মধ্যে নিজের জন্য ভালবাসা জন্মাবার যে সভ্য ও স্বীকৃত প্রথা আছে, সেই নিয়মে।

কান্তা আমল দেয়নি।

দু'জনে একসাথে কাটায় ঘণ্টা পাঁচেক।

ছাড়াছাড়ি হবার সময়, নিজের বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান্তা সোজা-সুজি বলে, তুমি কি সত্যি আমায় চাও?

ঃ চাই।

ঃ বেশ। এসো আমরা মিলেমিশে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করি। আমি কিন্তু ঘোমটা টেনে কনে বৌ সেজে থাকতে পারব না, তোমার সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে পারব না।

ঃ সংসারের হাঁড়ি-ঠেলা ওরকম লাজুক পুতুল মেয়ে বিয়ে করার সাধ্য আছে আমার? যারা আছে, তাদের পুষতে পারছি না বাপ-ব্যাটায় মিলে-- আরেকটা দায় ঘাড়ে চাপাব? তুমি রোজগার করছ, তোমার দায় বইতে হবে না—

ঃ এই সব হিসেব করে আমায় বিয়ে করতে চাইছ?

ঃ হ্যাঁ, এই সব হিসেব করেই তোমায় বিয়ে করতে চাইছি। দয়া করে যদি তুমি রাজী হও! দু'জনে আমরা কাজের মানুষ। কাজ বাদ দিয়ে মুখ শোঁকাশুঁকি করার প্রেম কি আমাদের পোষায়?

ঃ পোষায় না?

ঃ না। প্রেমের ব্যবসা যারা করে আমরা তাদের খদ্দের হতে চাই না শেষ পর্যন্ত প্রেম থেকে শুরু করে জীবনের সাধারণ সুখ-দুঃখ সব হারাতে হয়। তোমার আমার হৃদয়-মন বেচে ওরা টাকা করবে—নাঃ, এ নিয়ম মানা যায় না।

ঃ বুঝেছি। তোমার বড় বেশি বড় বড় কথা বলার ঝোঁক। তা, তুমি কি চাও যে টোপর পরে সং সেজে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মিছিল করে আসবে, আমি বেনারসী জরিতে জড়সড় হয়ে বলির ছাগীর মত থর থর করে কাঁপকে কাঁপতে তৈরী থাকব? না, দু'জনে মিলে রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে দলিল সই করে কাজ সারব?

ঃ যা তোমার ইচ্ছা। আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।

কান্তা এবার প্রায় হুকুমের সুরে বলে, না, সংক্ষেপে দলিল সই করে কাজ সেরে দরকার নেই, সবাইকে ডেকে আমোদ-আহ্লাদ হৈ-চৈ-এর ব্যবস্থা কর।

অনিল শুধু হাসে।

মনে হয় সে বুঝি শান্ত হয়েই আছে, ভিতরে আনন্দ বা আবেগ-উত্তেজনার কোন তরঙ্গই উঠে নি।

কিন্তু তার মুখ দেখেই কান্তা টের পায় উল্লাসের তার সীমা নেই। তবে আনন্দের অনুভূতিটা তার এমন গভীর হয়েছে যে উত্তেজনার রূপ নিয়ে বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না।

তার হৃদয় মন অভিভূত হয়ে গেছে।

একটু আশ্চর্যই হয়ে যায় কান্তা। ঘনিষ্ঠতা তাদের বহুদিনের, বন্ধুত্ব নিবিড়। সে

চিরদিন তাকে বন্ধু হিসাবেই জেনে এসেছে— কিন্তু অনিল কি অন্যভাবেও তাকে কামনা করেছে, তার জন্য অন্য আকর্ষণ বোধ করেছে ?

সে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, একটা সত্যি কথা বলবে ? তুমিই কি শুধু হিসাব কষেই মনস্থির করেছ ? আর কিছু নেই ?

ঃ আবার কি থাকবে ? তোমায় আমি খুব পছন্দ করি, সে তো তুমি জানোই।

ঃ শুধু পছন্দ কর ? আমার মন রাখা জবাব দিও না কিন্তু। খেয়াল রেখো আমি একজনের সঙ্গে কিছুদিন ঘর করেছি, মাতাল হলেও তার ছিল অতি বাস্তব চরম রকম প্রেম। মন রাখা কথা বানিয়ে বললে ধরে ফেলে চটে যাব।

অনিলের মুখ একটু গম্ভীর দেখায়।

ঃ তোমার ব্যাপার জানি বৈকি।

কান্তার গলা কেঁপে যায়, সব জানো ? চরম রকম প্রেম কেন বললাম, তার মানেও জানো ?

ঃ জানি। তাই তো মাঝে মাঝে সাধ হত অঘোরকে গিয়ে খুন করে আসি।

কান্তা চোখ বোজে। বাঁচালে ! কি করে এটা তোমায় জানাব তাই আমি দিনরাত ভাবছিলাম। আমি যে সত্যি কুমারী নই, স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে সব রকম অনাচার অত্যাচার সত্ত্বেও তার ঘর করেছি, পেটে আমার ছেলে এসে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমি যে সত্যি বিধবা, এটা তোমায় না জানিয়ে-

উমা এসে বলে, কান্তাদির কাছে খবর শুনে অবাক হয়ে গেছি। আমি জানতামও না কান্তাদি'র বিয়ে হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে ভিন্ন হয়ে এতকাল কুমারী সেজে ছিল।

অনিল বলে, না জানাটাই ভাল হয়েছে। জানলে কি কান্তার সঙ্গে এভাবে মিশতে পারতে ?

ঃ একটু অন্যভাবে মিশতাম। তাতে কি আসত যেত ?

ঃ সে হিসাব কি আজ করা যায় ?

উমা অনিলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, তার চুল এলোমেলো করে দিয়ে খুশির সুরে বলে, তোমরা সুখী হলে আমি যে কত সুখী হব ভাবতেও পারবে না অনিলদা !

অনিল তার ফসকা আঙটিটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে তার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি সুখী হবে না ? তোমার সুখের কারবার বুঝি ফুরিয়ে গেছে ?

উমা সলাজভাবে হাসে।

ঃ আমিও সুখী হব। দুঃখ বরণ করব কেন ? কার খাতিরে করব ? কিসের জন্য করব ?

একটু থেমে বলে, একজনের সঙ্গে ভাব হয়েছে ! একটা ছোটখাট অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার—মোটমাট সাড়ে তিনশ'র মত পায়। বাবা সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন।

অনিল খুশির সঙ্গে বলে, ঠিক করেছ। মাঝে মাঝে ভাবতাম অজিতকে চাবকে দিয়ে আসি। এটাই সব চেয়ে ভাল চাবকানি হবে।

উমা চোখ বোজে।

চোখ মেলে সে বলে, না, চাবকাবার মত ব্যাপার নয়। আমায় ঠকাতে চায় নি, ভুল করেছে। সেই চিরকেলে পুরুষালি ধারণা। প্রেমের জন্য পুরুষের পক্ষে যেটা দোষ নয়, মেয়েদের পক্ষে সেটাই মস্ত বড় দোষ। কারণ, মেয়েরা প্রেম জানে না, তারা নিছক সুবিধাবাদী।

অনিল বলে, এই ধারণার জন্যই ওকে চাবকানো উচিত।

উমা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, না, তোমার একথা মানব না। তাহলে আমাকেও চাবকানো উচিত—আমিও ভুল করেছি। যদি বকুলের সঙ্গে খেলা করত, ওর জীবনটা নষ্ট করে দিত—তাহলে ওকে চাবকানো উচিত হত। আমি তো বকুল নই, আমি শিক্ষিতা স্বাধীন মেয়ে, পুরুষের সঙ্গে সমান হয়ে গেছি সব দিক দিয়ে। এই ভুল সংস্কারটা না জন্মালে আমিও গোড়াতে ধরতে পারতাম—আমাদের প্রেম ধোপে টিকবে না। কায়দা কৌশল খাটিয়ে ওকে সামলে চলতাম, মন ভুলাতাম, ধরা দিতাম না। আগেই সব আঁটঘাট বেঁধে নিতাম।

ঃ সেটাই তো সুবিধাবাদ।

ঃ না। সেটা হত অবস্থাবাদ। যেমন অবস্থা সেই রকম ব্যবস্থা করা।

উমা নিশ্চয় নিজেকে ব্যঙ্গ করেই ব্যঙ্গের হাসি হাসে।—তা অবশ্য পারতাম না, তবে ব্যাপারটা এতদূর গড়াতেও দিতাম না।

অনিল চুপ করে থাকে।

উমা বলে, ওর কি কম জ্বালা ভেবেছ ? আমি বুঝলাম ভুল হয়েছে—দাগা খেয়েছি, মেনে নিয়েছি। ভালবাসায় সৃষ্টি চলছে—ও সেই ভালবাসাতেই বিশ্বাস হারিয়ে বসে আছে। সহজে কি ভাঙ্গবে ওর ভুল ? সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরবে।

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

ঃ উপায় থাকলে ভুল বুঝিয়ে শুধরে নিয়ে আমাদের দুজনের ট্র্যাজেডি ঠেকাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কোন উপায় নেই। আমি ভুল বোঝাতে গেলে ও সেটারও ভুল মানে বুঝবে।

কান্তা কল্পনাও করতে পারে নি যে তার সঙ্গে স্থায়ী মিলন ঘটবার ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরেও অনিলের মনে এত রকম দ্বিধা ও সংশয় জাগবে।

অনিল একদিন ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করে, মানিয়ে চলতে পারব তো আমরা ?

কান্তা আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন পারব না ? তুমিও আমায় জানো, আমিও তোমায় জানি। মানিয়ে চলা মানে তো বোঝা-পড়া ? সেটা আমরা ঠিকমতো করতে পারব।

ঃ শুধু বোঝাপড়া দিয়ে কি চলে ?

ঃ কেন চলবে না ?

ঃ আমার মন যদি বিগড়ে যায় ?

কান্তা হেসে বলে, আমি সামলে নেব, মন ঠিক করে দেব।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অনিল জিজ্ঞাসা করেঃ আমরা ভুল করছি না তো ?

কান্তা জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় না। আমরা তো স্বপ্নের দাম কষছি না—বাঁচার হিসাব করছি। কিন্তু—

শুধু অপূর্ব মুখের ভঙ্গিতে রাগ দুঃখ অভিমান ফুটিয়ে কান্তা বলে, তোমার সঙ্গে সাত দিন কথা বলব না। আমার আসল প্রশ্নটা চালাকি করে এড়িয়ে গেলে !

অনিল শান্তভাবেই বলে, না, এড়িয়ে যাব কেন ? আর কি কোন লুকোচুরি চলে ? আমি তোমায় স্কুলে পড়ার সময় থেকে ভালবাসি, ক্লাস সেভেন থেকে ভালবাসি। গরীব কেরাণীর ছেলের কি তোমার মত মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা পোষায় ? বরাবর তাই চুপ করে থেকেছি।

ঃ আমি কি এমন মহারাণীর মেয়ে !

ঃ তবু ফ্রক পরা জুতো মোজা পরা ফিতে আঁটা স্কুলে পড়া মেয়ে তো, ভালবাসা জানালেই বিয়ে করতে হবে, বিয়ে করলেই খাওয়া পরা শাড়ী ব্লাউজ সিনেমা থেকে শুরু করে—

ঃ সব কিছু জোগাতে হবে !

কান্তা হাসে।—কি চালাক ছেলেই তুমি ছিলে ? কথায় তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই।

অনিল বলে, চালাক ছেলে ? তুমি আমায় চালাক ছেলে বলছ ? এক নম্বর বোকা ছেলে। পরীক্ষায় বরাবর তোমায় ফার্স্ট করিয়ে সেকেন্ড হয়ে এসেছি। ইচ্ছা করলেই প্রত্যেক পরীক্ষায় টোটালে একশ' দেড়শ' নম্বর বেশ পেয়ে তোমাকে ডিঙিয়ে যেতাম ! পুরুষ আর মেয়ের ব্রেনের ওজনের তফাত জানো ?

ঃ ভাল করনি। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তুমিই আমার মধ্যে ফাঁকা অহঙ্কার জাগিয়েছ।

ঃ ভাল করলে মন্দ হয় ?

ঃ এটা ভাল করা নয়, শেষ পর্যন্ত যাতে ভাল হয়, সেটাই আসল ভাল করার হিসাব নয় কি ? ব্রেনের হিসাব ধরতে হবে না, বেশি ওজনের ব্রেন নিয়ে এই সহজ কথাটা তোমার জানা উচিত ছিল, এরকম আলতো দরদে মেয়েদের মাথা গুলিয়ে যায়।

অনিল হাসিমুখে বলে, বেশ, দোষ করেছি, প্রায়শ্চিত্তও করছি ! স্কুল কলেজে ক'বছর তোমায় ফার্স্ট করেছি—এবার থেকে সারাজীবন সব ব্যাপারে তোমায় ফার্স্ট করে রাখব !

কান্তাও হাসে।

ঃ সায় দেওয়া মাত্র ভাষা ফুটল ? এতকাল কি করে চুপ করে ছিলে তুমি !

অনিল হেসে বলে, কোনদিন একটু আমল দিয়েছ? ভয় হত, মুখ ফুটে কিছু বললে হয়তো মেলামেশাই বন্ধ করে দেবে।

ঃ খুব বিশ্রী ব্যবহার করে এসেছি?

ঃ বিশ্রী বলা যায় না,—শক্ত নীরস ব্যবহার। অন্য কেউ সহ্য করত কিনা জানি না।

কান্তা তার হাত চেপে ধরে।

ঃ এবার থেকে খুব মিষ্টি ব্যবহার পাবে। বুঝতে তো পারো, কতকাল নিজেকে সামলে এসেছি? হয়তো যতটা দরকার নয়, তার চেয়ে বেশি শক্ত হয়েছিলাম। অত হিসাব কি কষতে পারে মানুষ?

কান্তা মিষ্টি করে একটু হাসে।

অনিলের হাত ধরাই থাকে তার হাতে।

তারপর সে বলে, কাল ছুটি আছে, কাল দুপুরে তুমি এখানে খাবে। সকাল সকাল চলে এসো, দুজনে গল্প করব।

খুব মিষ্টি সুরে বলে, হয়তো সব ভয়-ভাবনা মিটিয়ে নেবার সুযোগও পাবে।

ঃ বেশি তেল মশলা মাংস পোলাও খেতে পারি না জান তো?

ঃ জানি।

পরদিন দশটার সময় অনিল এসে দেখে, বাড়ি ফাঁকা, কান্তা একা বাড়িতে রান্না করছে।

ঝোলের কড়া নামিয়ে কান্তা উনানে কেটলি চাপায়। চা আর ছানার বড়া এনে দিয়ে বলে, দুধটুকু কি করব, ছানা করে তোমার জন্য বড়া করে ফেললাম। তোমার পক্ষে ছানার জিনিস খাওয়া ভালো।

অনিল বলে, নিজে কেমন রাঁধতে পার নমুনা দেখাবার জন্য নেমতন্ন করেছিলে?

কান্তা আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

বলে, সত্যি তোমার খেয়াল ছিল না আজ বেবীর বিয়ে, সকাল বেলাই সকলে চলে যাবে? না, জেনেশুনেই এসেছ -

অনিল বলে, খেয়াল ছিল, আমাকেও তো রাতে খেতে বলেছে। আমি ভাবলাম, তোমরা বুঝি এখানে খাওয়াদাওয়া সেরে যাবে। নেমতন্ন খেতে এসে দরজার তালা আঁটা দেখে জব্দ হয়ে ফিরে যাব, তাও ভেবেছিলাম। তবু এলাম —ফিরে গেলেও স্রেফ অস্বীকার করব যে আসিনি, তুমি তামাসা করছ টের পেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তালা এঁটে চলে যেতে সাহস হল না বুঝি?

ঃ সাহস হল না মানে? আমি কি ছেলেমানুষ যে ওরকম সস্তা তামাসা করব? আমি ইচ্ছে করেই যাই নি। রেঁধে বেড়ে তোমায় খাওয়াব ঃ সারাদিন সাধ মিটিয়ে গল্প করব। বাড়ির কেউ জানেও না তোমায় খেতে বলেছি।

তবেই দফা সেরেছে। সারাদিন মেয়েলি গল্প করতে হলে দম আটকে যাবে।

মেয়েলি গল্প কেন? তোমার কাছে সাইকোলজির কথা শুনব।

দুপুর গড়িয়ে যায়। শান্ত নির্বিকার বৈজ্ঞানিকের মত অনিল তার সব প্রশ্নের

জবাব দিয়ে এবং নিজে থেকেও অনেক কথা বলে তার কাঁচা বিদ্যার দৌড় জাহির করে।

বেলা যত পড়ে আসে, ততই হাঁড়ি হয়ে উঠতে থাকে কান্তার মুখ।

রেগে বলে, থাক্, থাক্, আর ভাল লাগে না একঘেয়ে কথা শুনতে। তুমি ছাই শিখেছ সাইকোলজি, আসলে তুমি এক নম্বর ভাবুক ছেলে।

অনিল বলে, এক দুপুরে কি ভাববাদ বাদ দেওয়া যায়?

কান্তা বলে, ভাববাদ নয় সংস্কার।

অনিল বলে, সত্যি আমি বোকা, কিছুই শিখি নি। তোমার কাছে শিক্ষা পেলাম। বুঝবার চেষ্টা করব, আমি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

বারো

অজিতের জন্যই চাকরি সন্দেহ নেই।

অজিত গিয়ে চন্দ্রনাথের উপর চাপ না দিলে এ চাকরি তার না-ও হতে পারত। আরও অনেকে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল, অনেক রকম চাপও পড়েছিল চন্দ্রনাথের উপর।

কিন্তু অজিতের উপরোধটা যে বিশেষ কারণে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না চন্দ্রনাথের পক্ষে - তাও উমার অজানা নয়।

নিজের চাকরী পাওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে উমা কিন্তু ওভাবে চিন্তা করে না।

তার বাবার পুরাতন ছাত্র হিসাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য চন্দ্রনাথই তাকে চাকরিটা দিয়েছে।

সেও চন্দ্রনাথের কাছে কৃতজ্ঞ।

চন্দ্রনাথের সম্পর্কে সাবধান করে দিতে এসে অপমানিত হয়ে যাবার পর অজিত তার চাকরিটা খাওয়ার চেষ্টা করেছে কিনা, তাকে তাড়াবার জন্য চন্দ্রনাথের উপর চাপ দিয়েছে কিনা উমা জানে না, চাকরি সে করে চলেছে।

উমা আর অজিতের ব্যাপারটা ভাল করে জানবার জন্য কী ছেলেমানুষী কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহলই জেগেছিল চন্দ্রনাথের প্রাণে!

প্রেমের খেলা ফুরিয়ে গেছে।

সম্পর্ক চিরদিনের জন্য চুকে গেছে।

তবু অজিত এসে চাকরিটা উমাকে দেবার জন্য তার উপর এমন ভাবে চাপ দেয়!

অজিত এবং তার মধ্যে আছে নানা ব্যাপারে সহায়তা, ইচ্ছা করলে অজিত তার ক্ষতিও করতে পারে—কিন্তু সেও যে ইচ্ছা করলে অজিতের সঙ্গে বিশ্রী রকম শত্রুতা করতে পারে, এটাও নিশ্চয় তার খেয়াল আছে।

অজিত কিছু জানাবে না।

পিতার মত স্নেহ করে, উমার হৃদয় জয় করে, সে ব্যাপারটা জানবার বুঝবার চেষ্টা শুরু করেছিল।

কিন্তু কি বিশ্রী রকম বাঁকা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অফিসের চাকুরে-বাকুরেদের মন !

মুখে যাই বলুক, যতই তেজ দেখাক, চন্দ্রনাথ স্নেহের সম্পর্ক তুলে দেয় উমার সঙ্গে। পনের দিনের মধ্যে দূরে সরে গিয়ে নিজেকে শুধু অফিসের কাজ-আদায়কারী নির্মম নির্বিকার মনিবে পরিণত করে ফেলে। এত সহজে এত অল্প সময়ে এটা অবশ্য সে সম্ভব করতে পারত না—উমা যদি সর্বান্তঃকরণে সহায়তা না করত।

যদি সে তার মুখের কথার বাহাদুরীর জের, স্নেহ-মমতার শুদ্ধ পবিত্র সম্পর্ক নির্ভয়ে চালিয়ে যাবার হুকুমের জের টেনে চলার জিদ ধরত !

প্রক্রিয়াটা আসলে শুরু করেছিল উমাই।

চন্দ্রনাথ হুকুম দিয়ে না ডাকলে কাছে যাবে না, তার কামরাতেও নয়, তার বাড়িতেও নয়।

মনিব চন্দ্রনাথ তাদের বাড়িতে এলে ভদ্রতা রক্ষা বা মনিবের মন রক্ষার খাতিরেও সে চন্দ্রনাথের বাড়িতে পদার্পণ করবে না।

চন্দ্রনাথ দু'বার এসেছে তাদের বাড়িতে।

অন্য সকলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাকে বসতে দিয়েছে, আদর-অভ্যর্থনা জানিয়েছে, নিজে সোজাসুজি না ডাকা পর্যন্ত উমা তার সামনে আসে নি। 'চন্দরবাবু এসেছেন' —খবরটা বাড়ির পাঁচজন পাঁচ সাত বার তাকে জানানো সত্ত্বেও !

'চন্দর তোকে ডাকছে উমা'—হরিপ্রসন্ন এসে এ সংবাদ দেবার পর তবে সে তার সামনে গিয়েছে।

মেয়েদের চলতি কৈফিয়তের ছুতো তুলে বলেছে, কতক্ষণ এসেছেন ? শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে।

ঃ শরীর খারাপ ? তবে আজ আর অফিস যেও না ! আজ তোমার ছুটি।

না না, সেরকম শরীর খারাপ নয়। দু'চার ঘণ্টার ব্যাপার। মাথা ধরেছে। স্নান করে খেতে খেতেই ঠিক হয়ে যাবে। মিছিমিছি কামাই করব কেন ?

উমা স্পষ্টই অনুভব করেছে তার সর্বাত্মক উপেক্ষায় পরম স্বস্তি বোধ করেছে চন্দ্রনাথ।

মুখের কথায় বড়াই-এর দায় থেকে সে যে স্বেচ্ছায় তাকে রেহাই দিয়েছে। এজন্য চন্দ্রনাথ সত্যসত্যই বিষম একটা বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ায় আরাম বোধ করেছে।

না, উমা তার বাড়তি স্নেহ-মমতার সম্পর্ক দায়ী করে না।

সে শুধু কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে তার অফিসে চাকরির দায়টা পালন করে যেতে চায়।

সে কাজ করবে।

কাজ দেখিয়ে উন্নতি করবে।

চাকরি দিয়েছে বলেই ফালতু ফেভার সে মানবে না।

দু'সপ্তাহেই ধাতস্থ হয়ে গেছে চন্দ্রনাথ।

অফিসের কাজে অন্য সকলকে যে ভাবে ডাকে—যে ভাবে শুধু কাজের কথা বলে বিদায় দেয়—ঠিক সেই ভাবেই উমাকে ডাকে, কাজের কথা বলাবলি করে বিদায় দেয়।

একটি বাড়তি কথা নয়।

একটি বাড়তি মুখভঙ্গি নয়।

যেন নির্বিকার ঈশ্বর।

অফিসিয়াল নিয়মনীতির রূপক ঈশ্বর।

এতদিন চুপচাপ ছিল অফিস।

চন্দ্রনাথ কেন তাকে চাকরি দিয়েছে, কেন তার সঙ্গে চন্দ্রনাথের অফিসে খানিকটা, বাইরে অনেকটা মেলামেশা—এসব যেন একেবারে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল সকলের কাছে।

আকাশে সূর্য ওঠে, চাঁদ ওঠে, দিন হয়, রাত্রি হয়, মানুষ আর অন্য প্রাণীরা ঘুমায়—ঘড়ি ধরে অফিসে এসে ধরা বাঁধা টাইমে কাজ করে যাওয়া যায়, তারপর ছুটি পাওয়া যায়।

উমাকে চন্দ্রনাথ কেন অফিসে ঢুকিয়েছে সেজন্য যেন কারো মাথা ব্যথা ছিল না।

ইংরাজ মার্কিনী ফরাসী পার্শী কত মার্কার কত রকমের কত বয়সের কত বিপন্না মেয়ে যে চন্দ্রনাথের কাছে আসে।

চন্দ্রনাথ সকলকে সামলায়।

টাকা দিয়ে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে, চাকরি জুটিয়ে দিয়ে, এমন কি বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে পর্যন্ত।

উমাকে অফিসে একটা বিশেষ বেতনের বিশেষ ধরনের চাকরি দিয়েছে বলে কেউ ব্যাপারটাকে এতটুকু গুরুত্ব দেয় নি।

উমার সঙ্গে চন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ঘনিষ্ঠতাও কেউ গ্রাহ্য করার মত ব্যাপার ভাবেনি।

চন্দ্রনাথ তাকে বরবাদ করেছে, একমিনিটের জন্যও কাজের বাইরে অন্যভাবে তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করেছে, অফিসের আর দশজনের মতই তাকে শুধু অফিসের কাজের ব্যাপারে ডেকে নিয়ম মাফিক নীরস গলায় হুকুমের সুরে শুধু কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ ধমক-ধামক উপদেশ দিতে শুরু করেছে—এটা জেনেই যেন ঢিল-খাওয়া মৌচাকের মত সচকিত গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল অফিসটা।

কয়েকদিনের মধ্যে সেটা থেমেও যায় হঠাৎ—উমা অন্য অফিসের একটি চাকুরে ছেলেকে বিয়ে করবে, এ খবরটা রটবার পর।

ফিসফাস গুজগাজ চলে।

এ কি প্রেমের বিয়ে?

সখের বিয়ে?

চন্দ্রনাথের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্ল্যান করা বিয়ে?

অফিসে উমা ছাড়াও আধডজন নানা বয়সের স্ত্রী-জাতীয়া মানুষ কাজ করে।

দু'তিন জন উমার সঙ্গে কথাও বলে না।

অন্যেরা অনেক চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারে না কেন উমা হঠাৎ দু'মাসের মুখ চেনা কেরাণী আনন্দময়কে বিয়ে করতে ব্যগ্র হয়েছে।

প্রেম হয় নি।

ভালবাসার বিয়ে নয়।

কোন পক্ষ পরস্পরের কাছে প্রেম নিবেদন করে নি –বিয়ের প্রস্তাবও তোলে নি।

ততদূর গড়ায় নি তাদের ঘনিষ্ঠতা।

উমা নাকি আনন্দময়ের ঠিকানা, তার বাপ-দাদার ঠিকানা জানিয়ে হরিপ্রসন্নকে বলেছিল, আমার বিয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠেছ। আমি নিজেই পাত্রের খোঁজ দিলাম। ব্যবস্থা কর।

হরিপ্রসন্ন কাতরভাবে বলেছিল, ব্যবস্থা করব মানে কি রে? কি ভাবে ব্যবস্থা করব?

উমা রাগে নি।

শান্তভাবে বলেছিল, একজন পাত্রের খোঁজ পেলে মেয়ের বিয়ের জন্য কি ব্যবস্থা করতে হয় তাও কি তুমি জানন‌া বাবা?

ঃ তুই যে মস্ত বড় চাকরী করিস। মুশকিল তো ওইখানে।

মাথা নিচু করে রেখে উমা বলে, ওটা তুমি ভুলে যাও বাবা। তোমার একটা মেয়ে আছে, তার বিয়ে দেবে। ঘটকের বদলে মেয়েই তোমাকে পাত্রের খোঁজ দিয়েছে—এটাও বড় মনে করো না।

ঃ তোর কথা শুনে মাথা ঘুরে যায়।

ঃ সোজা কথা সহজভাবে নিতে পার না তাই মাথা ঘুরে যায়। বারবার বলছি, অন্য সব কথা ভুলে যাও। তোমার একটি মেয়ে আছে, তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছ, একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছ। আর দশটা মেয়ের বাপ যেভাবে খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা করে, তুমিও তাই করবে।

হরিপ্রসন্ন খানিকক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলে, আর দশটা মেয়ের মত তোকেও মুখ বুজে চুপ করে থাকতে হবে কিন্তু।

ঃ থাকব বৈকি।

হরিপ্রসন্ন বা আত্মীয়স্বজন অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে উমা এত সহজে বিয়ে করতে রাজী হবে।

তাও এত ভাল চাকরি পাওয়ার পর।

অনিলও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এটা তার অজিতের সঙ্গে পাল্লা দেবার জেদ কিনা।

অজিত বিয়ে করেছে—সে-ও দেখিয়ে দিতে চায় যে ভাল বিয়ে তারও হতে

পারে, সে-ও স্বামী পুত্র নিয়ে সংসারে সুখী হতে জানে—অজিতই জগতে একমাত্র পুরুষ নয় !

উমার ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না।

সে শান্ত, নির্বিকার।

চন্দ্রনাথের অফিসে চাকরি করার মতই যেন আরেকটা কর্তব্য পালন করবে ঠিক করেছে।

কে জানে হরিপ্রসন্নই চন্দ্রনাথকে খবর দিয়েছিল কি না ! ভাল ঘরের একটি চাকুরে স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে—বিয়ে না-করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মেয়ে তার বিয়ে করতে রাজী হয়েছে,—আনন্দে হরিপ্রসন্ন যেন পাগল হয়ে গেছে।

হরিপ্রসন্ন খবর দিক অথবা দশজনের কাণা ঘুষা কাণে গিয়ে থাক, একদিন চন্দ্রনাথ উমাকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠায়। সোজাসুজি প্রশ্ন করে, তোমার নাকি বিয়ে ?

তার থমথমে মুখ দেখেও উমা হাসি মুখে বলে, হ্যাঁ। আপনি কার কাছে শুনলেন ? এখনো দিন টিন কিছুই ঠিক হয়নি—

চন্দ্রনাথ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, তোমার না ধনুকভাঙ্গা পণ, জীবনে কখনো বিয়ে করবে না ?

উমা বলে, দিব্যি গেলে প্রতিজ্ঞা করি নি। বিয়ে করব না ভেবেছিলাম—মতটা বদল করেছি।

: তবেই তো আমাকে মহা মুশকিলে ফেললে !

: আপনার কি মুশকিল ?

: কোন বিবাহিতা মেয়েকে তো আমি এই পোস্টে রাখতে পারব না। তুমি কোনদিন বিয়ে করবে না জেনেই চাকরিটা দিয়েছিলাম।

উমা ধীর স্বরে বলে, আমার কাজ আমি করে যাব—কাজে গাফিলতি হলে তাড়িয়ে দেবেন।

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়ে, তা হয় না। অন্য কোন পোস্টে হয়তো চলতে পারত, এ পোস্টে চলবে না। আজ এটা, কাল ওটা – ম্যারেড গার্লের অনেক ঝনুঝাট।

উমা আরও ধীরে ধীরে জোর দিয়ে বলে, ও সমস্তই আমি ভেবেছি। আমার ঝনুঝাটে আপনার কাজের যাতে না ক্ষতি হয়, সে দায়িত্ব আমার। বিয়ের জন্যও না হয় একদিনের ছুটি পর্যন্ত নেব না। দরকার হলে ছেলেমেয়ে বন্ধ থাকবে।

চন্দ্রনাথ তবু মাথা নাড়ে।

: বুঝলাম। তোমার ইচ্ছা থাকলেই তো সব হবে না—আর একজনের ইচ্ছার প্রশ্ন আছে।

: আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি ওসব কিছু হয় ? সে-সব দিনকাল আর নেই। বাবাই সব ঠিকঠাক করেছেন, কিন্তু আপনাকে খুলেই বলি—আমাদের জানা-শোনা আছে। এসব বিষয়ে পরিষ্কার কথাও হয়েছে।

ঃ আমার আসল কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না। সবই মানলাম—সব ব্যবস্থাই তুমি করবে। কিন্তু এখনকার মন কি তোমার থাকবে? মনপ্রাণ দিয়ে না করলে এ পোস্টের কাজ ঠিক মত করা অসম্ভব।

অভিনেতার মত ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে তাকে ইঙ্গিতে কথা বলতে বারণ করে, ধীরে সুস্থে মোটা বিলাতী সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে পরম আরামে সিগারেটে টান দিয়ে চন্দ্রনাথ আবার বলে, অন্তত আমি তাই মনে করি। এখন তোমার চাকরিগত প্রাণ—তোমার চাকরির ওপর সংসার নির্ভর করছে। চাকরি ছাড়া তোমার অন্য ইন্টারেস্ট নেই, অন্য চিন্তা নেই। চাকুরে একজনের সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার জীবনে অন্য ইন্টারেস্ট আসবে, মনে অন্য চিন্তা জাগবে। চাকরির মায়াও তোমার কমে যাবে—তোমার চাকরি থাক বা না থাক, আর একজনের তো থাকছে!

উমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবে।

চন্দ্রনাথ মিষ্টি সুরে বলে, খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে আমাকে? কিন্তু কি করব বল—এটাই আমার প্রিন্সিপল্। অফিসের ব্যাপারে আমি কোন সেন্টিমেন্টের ধার ধারি না, এ ক্ষেত্রে ওসব হিসাব আমার কাছে বাতিল। কারো জন্যে আমি এ নিয়মের এদিক-ওদিক করব না, নিজের বাপ-ভাই বৌ-ছেলেমেয়ের খাতিরেও নয়।

সখেদে নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ্রনাথ বলে, তুমি বিশ্বাস করবে না—আমার নিজের খাতিরেও কখনও এ নিয়মের এ হিসেবের এতটুকু এদিক ওদিক করি নি, কখনও করব না। আমার নিজের মনে যত কষ্টই হোক—নিয়ম তো আমার মনের কষ্টকে খাতির করবে না! ক্ষমা করা যায় না এরকম একটা দোষ করেছিল বলে আমার এক শালাকে বরখাস্ত করেছিলাম—সে ক'বছর আগেকার কথা। শালাটির চাকরি গেলে তার অবস্থা কাহিল হবে জানতাম—কিন্তু কি করব! মোটে দু'তিন বছর বিয়ে হয়েছিল। আমার স্ত্রী ভয়ানক রেগে গিয়ে জানিয়েছিলেন অফিস থেকে তার ভাইকে তাড়াতে হলে তাকেও বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে। বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, এক বছরের বেশি সম্পর্ক রাখেন নি। তবু আমি শালাকে কাছে ফিরিয়ে নিই নি।

উমা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আপনার কথা বুঝেছি। একটা দুটো দিন একটু ভেবে দেখি।

ঃ ছুটিই নাও না দু'একটা দিন?

ঃ ছুটি নেবার দরকার হবে না।

বিদায় নিয়ে দৃঢ়পদে সে বেরিয়ে যায়।

ভাইকে চাকরি থেকে তাড়াবার জন্য চন্দ্রনাথের স্ত্রী যে রাগ করে বছরখানেক বাপের বাড়ি কাটিয়ে আসবে সেটা আশ্চর্য নয়।

প্রৌঢ় বয়সে চন্দ্রনাথের আরও একবার বিয়ে করার ঝোঁক চেপেছিল।

বয়স্থা মেয়ে খুঁজছিল এ-কে দিয়ে ও-কে দিয়ে।

রমানাথ ঘটকের ভূমিকায় না নেমে নিজের একটি অরক্ষণীয়া বোনকে সঁপে দিয়েছিল তার হাতে।

সোজাসুজি কোন শর্ত হয় নি কিন্তু কথাবার্তায় এটা প্রকাশ পেয়েছিল যে এ বিয়ে যদি হয় বেকার রমানাথকে ভাল একটা চাকরি দিতে হবে চন্দ্রনাথকে।

নিজের অফিসেই হোক বা অন্য কোন অফিসেই হোক।

সোজাসুজি কথা না দিলেও চন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে তাদের এই প্রত্যাশাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

প্রৌঢ় বয়সে সুন্দরী যুবতী বৌ পেয়ে—সামাজিক ভাবে সর্বজনস্বীকৃতভাবে পেয়ে—কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা চন্দ্রনাথ তার কঠোর নিয়ম আর সব প্রিন্সিপল্ ভুলে গিয়ে রমানাথকে এমন চাকরি দিয়েছিল যে পদের সে মোটেই যোগ্য ছিল না।

তবে চাকরি করার হিসাবে যোগ্যতার মাপকাঠি যে বাতিল হয়ে গেছে সেটা অবশ্য আজ জোর করে বলা যায়। মনিব হলেও সম্পর্কে সে তার ভগ্নীপতি তো বটে।

ভগ্নীপতি বলে মানতে তার মন চাইত না।

মাঝে মাঝে বোনের কাছে যেত। সরমা তাকে চিরদিন প্রাণ দিয়ে স্নেহ করে এসেছে।

সেই ভাই-এর চাকরি খতম হলে তার রাগ হবারই কথা!—রমানাথকে ভাল একটা চাকরি দেওয়া হবে এই কড়ারেই সে-ও তো বুড়ো বরকে বরণ করতে রাজী হয়েছিল, স্বামীর মন জুগিয়ে তার ঘরও করছিল নিজের প্রথম বয়সের সাধ-আহ্লাদ সুখ-দুঃখের হিসাব তুচ্ছ করে রেখে।

বছরখানেক নয়, ওটা চন্দ্রনাথের বাড়িয়ে বলা—রাগ করে সরমা কয়েক মাস বাপের বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে এসেছিল।

তারপর কী আপোষ হয়েছিল তাদের মধ্যে তা তো উমার অজানা নয়।

অন্য একটা অফিসে রমানাথকে সাধারণ একটা চাকরি চন্দ্রনাথ জুটিয়ে দিয়েছিল।

আজও রমানাথ সেই চাকরিতে বহাল আছে। ইতিমধ্যে তার বেতনও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেটা কার অথবা কিসের খাতিরে ঘটেছে কেউ তা জানে না।

আনন্দময়ের দুই কাকা আর এক পিসে রবিবার সকালে হরিপ্রসন্নের বাড়িতে হাজির হয়!

মেয়ের সঙ্গে ছেলের আলাপ পরিচয় হয়েছে—বিয়েটা একরকম ওরাই নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে নিয়েছে।

সেটাই যেন টেনে এনেছে আনন্দময়ের দুই কাকা আর এক পিসেকে। মেয়ে দেখে পছন্দ করে যথারীতি বিয়ের ব্যবস্থাদি করার জন্য।

তিনজনের জন্য লুচি হালুয়া মিষ্টি এবং গরম পানীয় এসে হাজির হলে হরিপ্রসন্নের যেন চমক ভাঙ্গে।

ঠিক কথা।

ঘরে তার বয়স্কা বিবাহযোগ্যা কন্যা। মেয়ে বড় অফিসে মোটা মাইনের চাকরি

করে কি করে না, সেটা আলাদা কথা। কোন পাত্রের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসাটাই তার পরম সৌভাগ্যের কথা—পাত্র কেমন, পাত্র তার পছন্দ হবে কি না, এসব পরের কথা।

তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যারা এসেছে তাদের যথাযোগ্য সমাদর তাকে করতেই হবে।

তার যদি ভাল না লাগে, ইচ্ছা না হয় প্রস্তাব সে বাতিল করুক।

সে অধিকার তার আছে।

কিন্তু সমাদর বাতিল করা অনিয়ম, অসামাজিক কাজ।

বাড়ি মানে এখন দাঁড়িয়েছে বাড়ির খুব ছোট একটা অংশ। বড় অংশটা ভাড়াটের কবলে গেছে।

ভাসা ভাসা কথা হয়। দিনক্ষণ কিছুই স্থির হয় না।

মোটা আটার শক্ত লুচি আর হালুয়া খেয়ে বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে বিদায় নেয় আনন্দময়ের দুই কাকা আর এক পিসে।

একটা রসগোল্লা সন্দেশ পর্যন্ত দিল না! শুধু ভেজিটেবল তেলের লুচি আর ওই তেলে তৈরী খানিকটা হালুয়া!

সস্তা খাবারটা পিসী এনে দিতে পারত, দয়াময়ীও এনে দিতে পারত।

উমা নিজে ওসব নিয়ে এসে তার বিয়ের ঘটকদের সমাদর করবে—এটা মনে মনে বড়ই অপছন্দ করে হরিপ্রসন্ন।

ওরা বিদায় হয়ে যাবার পর ভিতরে গিয়ে উমাকে বকুনি শুরু করতেই দয়াময়ী খ্যান খ্যান করে ভাঙ্গা কাঁসার আওয়াজে বলে, চুপ কর, চুপ কর। তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি, মেয়ে তোমার মান রেখেছে ভদ্রতা রেখেছে।

পিসী বলে, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে ভদ্দরলোকেরা, তাদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে খেয়াল নেই? তোর বংশের নইলে যে নিন্দে রটবে রে, তোর মেয়েকে কেউ ঘরে নেবে না।

বাপের চিমসানো মুখ দেখে উমা রেগে বলে, তোমরা চুপ কর দিকি। বাবা সব জানে, সব বোঝে। মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে চোর ছ্যাঁচর এলে তাদেরও খাতির করতে হবে নাকি?

চাকুরে হোক আর যাই হোক, বি. এ., এম. এ. পাশ হোক বা নাই হোক—ছেলে এবং মেয়ে নিজেরা পরামর্শ করে বিয়ের ব্যবস্থা করবে—এটা মানতে তাদের বিষম আপত্তি।

জানা চেনা আছে? থাক।

আজকাল ওটা মানতেই হবে। মেয়েরাও যখন অফিসে ছেলেদের সঙ্গে কাজ করছে।

কিন্তু বিয়ে হবে সামাজিক ভাবে।

গুরুজনেরা এসে মেয়ে দেখুক বা না দেখুক, অন্তত মেয়ের বাপের সঙ্গে বিয়ের

দেনা-পাওনার ব্যাপার আর বিয়ের তারিখ স্থির করা পর্যন্ত সব বিয়ের কথা বলে যাবে।

আনন্দময়ও নিশ্চয় ব্যাপার বুঝে চুপ করে থেকে সায় দিয়েছে—নইলে কি তার কাকা পিসেদের এতখানি সাহস হত !

আনন্দময়কে অবশ্য উমা জানিয়ে দিয়েছে—বিয়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা চলবে না।

চন্দ্রনাথ মানবে না।

তার চাকরি যাবে।

যে চাকরির উপর নির্ভর করে তার সংসারের বাপ ভাই মা বোনের চাকাটা এখনো ঘুরছে। পিসী মাসীদের হিসাব নয় বাদ দেওয়াই গেল।

ছেচল্লিশ

একটা পার্শেল আসে বকুলের নামে। কি গোলমাল ছিল, বিনয়কে পোস্টাপিসে গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়।

দু'ঘণ্টা পরে বকুলদের বাড়ি গিয়ে দেখে সতীশের একটা ফটো হাতে নিয়ে বকুল অঝোরে কাঁদছে !

সামনে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে আরও কতকগুলি পুরোনো চিঠি দলিল-পত্র।

বকুল হাসে, কাঁদে।

তার ফাঁকে ফাঁকে বলে, কিভাবে রেহাই পেলাম দেখো ! মহাপাপ করে জন্ম জন্ম নরক ভোগ করতে চেয়েছিলাম, শেষ মুহূর্তে নিজেকে বাঁচাবার বুদ্ধি পেলাম। কাল তুমি সবাইকে বলে কয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলবে—ঠিক আজকে তোমারি হাত দিয়ে ফটোটা এল, দেওরের চিঠিটা এল, ওনার ডায়েরীগুলি এল, উকিল জেঠার চিঠি এল !

তার ভাব দেখেই বিনয় টের পেয়েছিল, তার মনের চিরকালের সংস্কারগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

তার মনের অবস্থা ভাল করে না বুঝে তাকে এখন কিছু বুঝিয়ে বলতে যাওয়া মানেই ভস্মে ঘি ঢালা।

হয়তো আরও বিগড়ে যাবে তার মন।

ঃ উকিল জেঠার চিঠি ?

ঃ পড়নি ?

ঃ আমি কি পার্শেল খুলেছি ? তুমি আকুল হয়ে কাঁদছ, তোমার দেওরের চিঠিটা মেঝেতে পড়ে আছে দেখে তুলে নিয়ে পড়লাম।

জামার আড়ালে বুকে-লুকোনো চিঠিটা বার করে বকুল তার হাতে দেয়। বলে,

উকিল-জেঠা হলেন আমার জেঠশ্বশুর। সবাই উকিল-জেঠা বলে—খুব নাম করা উকিল। চিঠিটা পড়, কাউকে কিছু বলবে না। সবাই কেমন জব্দ হয়েছে দেখো।

হাসি কান্না থেমে গেছে বকুলের। তার খানিকটা ভারিক্কি গিন্নিপনার ভাব।

বাদামী রঙের ফুলস্ক্যাপ কাগজে টানা জড়ানো হরফে লেখা বকুলের উকিল-জেঠার লম্বা চিঠিটা পড়বে, না বকুলের কথা শুনবে বিনয় ভেবে পায় না।

বকুল বলে চলে, সাত তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ি খেদিয়ে দিলে, ঘরদোর সব যে উনি করেছেন, সব যে আমার নামে, এটা বাবুদের খেয়াল ছিল না। আমার নামে তেরো হাজার টাকা জমা—পাশ বইটা পর্যন্ত আটকে রেখেছিল। টাকা তোলবার চেষ্টা করেছে নিশ্চয়—পারে নি বলে এখন আমায় খাতির করে ভাগ বসাবার চেষ্টায় আছে!

উকিল-জেঠার চিঠি লম্বা—কিন্তু আসল কথাটা দু'চার লাইনেই লিখে দেওয়া যেত। বকুলের দেওরদের মধ্যে চলেছে কলহ বিবাদ, সৃষ্টি হয়েছে একটা খিচুড়ি পাকানো অবস্থার—বকুলকে গিয়ে এখন তার মৃত স্বামীর সংসারের দায় নিতে হবে।

দায়!

দায় বৈকি!

উকিল-জেঠা সেটা জানিয়েছেন ইঙ্গিতে। না জানালেও চলত। এটুকু কে আর না বোঝে সংসারে?

ঘর দুয়ার তার নামে, সতীশের জমানো টাকা তার নামে—কিন্তু দখল তো তার নেই!

তাই আপন হয়ে গিয়ে আপোষ করতে হবে—ছেলেমানুষ তাকে সামলাতে হবে আরও ছেলেমানুষ দেওরদের বৌ ক'টাকে!

বিনয় বলে, সারা জীবন এই দায় নিয়েই কাটবে?

বকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তাই তো বলছিলাম! একটা পাপ করে চিরকাল নরকে পচবো—শেষ মুহূর্তে কেমন বেঁচে গেলাম দেখো! ছেলেবেলা থেকে এত পূজা করে আসছি—সে কি মিছে হয়! কি নিয়ে জীবন কাটাব ভেবে পাচ্ছিলাম না, সারাজীবনের অবলম্বন জুটে গেল। মাগো, সব ক'টাকে সামলে চলতে হবে।

সরল সহজ ভাব, কোনরকম ছলনা নেই, চাতুরী নেই। সত্য সত্যই সে প্রেমের খপ্পর থেকে রেহাই পেয়েছে—মৃত স্বামীর পরিবারে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার সম্মানের আসনটুকু পাবার নামেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে!

অজানা প্রেমের অজানা সার্থকতার নতুনত্বের চেয়ে জানা বোঝা চেনা জীবনের বাঁধনই তার কাছে বড় আর দামী!

বকুল যেন ধরেই নিয়েছে যে বিনয়ের মনেও একই ভাব জেগেছে—স্বামীর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে থাকার চেয়ে বড় সৌভাগ্য বিধবার কি হতে পারে?

তাকে না পাওয়ার জন্য বিনয়ের সম্ভাব্য ব্যথা-বেদনার দিকটা বকুল একেবারে এড়িয়ে যায়, ওসব হিসাব-নিকাশের প্রশ্ন যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে।

সাধারণ স্নেহ-মমতা আদর-যত্নের ঠাট বজায় রাখতে এতটুকু গাফিলতি দেখায় না বকুল।

মিষ্টি সুরেই বলে, একটু বসো, তোমার যে খিদে পেয়েছে সেটা খেয়াল আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চা টোস্ট অমলেট এনে সামনে ধরে দিয়ে বলে, মুখ বুজে খেয়ে নাও। তারপর কথা হবে। আমিও মরে যাচ্ছি না, তুমিও পালিয়ে যাচ্ছ না।

বিনয়ের এতক্ষণ খেয়াল ছিল না কিন্তু খিদে পেটের মধ্যে গুড় গুড় করে ডাকছিল।

সে নীরবে খেয়ে যায়।

মনের মধ্যে শুধু ঘুরে বেড়ায় একটি প্রশ্ন—বকুল কেন আজ এমন সতেজ?

খানিক আগে কান্নায় গলে গিয়েছিল।

এর মধ্যে সামলে নিয়ে সতেজে কথা কইছে।

ঃ তোমার তবে মন ছিল না? আর কিছু করবার নেই বলে রাজী হয়েছিলে?

ঃ বললাম যে আগে খেয়ে নাও, তারপর ওসব কথা হবে।

বিনয়ের খাওয়া হলে ট্রে-টিপট পায়ের কাছে মাটিতে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বকুল বলে, আমাকে তুমি বুঝবে না।

ঃ না বুঝলে না বুঝব, তুমি আর একটু খোলসা করে বুঝিয়ে বল।

কী বিপদ। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায় নি কিন্তু সবাই যে চুপ করে তার জবাব শোনার জন্য কান পেতে আছে, এটা বুঝতে কি আর বাকী ছিল বকুলের!

খাটের কাঠটা আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে এমন আচমকা সে কথা বলে যে বিনয় ভড়কে যায়।

ঃ শাস্ত্রের কথাটা জান তো? যে পাপ করে আর যে পাপ সয়—দু'জনেই সমান পাপী। বৌ বোন মেয়েদের নিয়মে না চলাই পাপ।

ঃ সে তো বুঝলাম। কিন্তু অনিয়মটা কোথায় হচ্ছে?

ঃ স্বামীর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে নিজে সুখ খুঁজব এ পাপ মেনে-নেওয়া পাপ নয়?

যার সে বৌ ছিল, যার সঙ্গে তার প্রেম ছিল না, তার বিষয়-সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার পেয়েই কি বিগড়ে গেল বকুলের মন?

বিনয় ভাবে, যে মন এত সহজে বিগড়ে যায়, সেই মনটা জয় করার জন্য সে এতদিন রীতিমত সাধনা চালিয়ে এল?

জীবনে শত ধিক্। হাজার ধিক্ তার প্রেমের সাধনায়।

বাড়ি ফিরে ঘরের কোণায় আশ্রয় নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেয়ে সে দিশেহারার মত আকাশ পাতাল ভাবে।

বকুল তেমনি ভাবে আসে—বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে যেভাবে সে নীচের তলায় মন্দাকিনীর সঙ্গে কথা বলে, দোতলায় বিনয়ের ঘরে এসেছিল।

বিনয়ের বিচলিত ভাব দেখে বলে, উল্টো-পাল্টা ভেবো না। তুমিও বেঁচে গেলে, রেহাই পেলে।

ঃ আমি রেহাই পেতে চাইনি।

ঃ এখন তোমার জ্বালা ধরেছে, পরে বুঝবে কিভাবে তুমিও বেঁচে গেলে, আমিও বেঁচে গেলাম।

একটু থেমে ভারিক্কি সুরে বকুল বলে, স্বামীর অত বড় সংসারের দায় নেব—ঝনুঝাটের কি সীমা থাকবে ভেবেছ? আমি বুঝেছি তোমার মনের কথা—তুমি ধরে নিয়েছ যে আমি মজা করার লোভে সব উলটে পালটে দিলাম। ওরে বাপরে—তুমি জানো না ওটা কেমন সংসার। ওই টাকা নিয়ে, বাড়ির মালিকানা নিয়ে কত ঠোকাঠুকি যে বাঁধবে—একটা দিন শান্তি পাব না। কিন্তু কি করব বল? স্বামী দায় চাপিয়ে গেছেন—সামান্য সুখের জন্য মেয়েমানুষ কি এ দায় এড়িয়ে যেতে পারে?

এমন অদ্ভুত শোনায় বকুলের মুখে এসব পাকা পাকা কথা!

সামান্য সুখ!

তাদের প্রেমের সার্থকতা ও সারাজীবনের মিলন বকুলের কাছে পরিণত হয়ে গেছে সামান্য সুখে!

বিনয় বলে, থাক্ থাক্। আর বেশি কিছু বলতে হবে না, আমি তোমার মনের কথা বুঝেছি। তুমি আমাকেও হাতের পাঁচ রাখতে চাও—আবার ওদিকে গিয়ে তেরো চোদ্দ হাজার টাকা বাগিয়ে গিন্নিপনা করে আসার মজাও লুটতে চাও।

ঃ তাই ভাবলে তুমি?

ঃ আর কি ভাবব?

বকুল কেঁদে ফেলে।

ঃ বিনয়দা, মানুষ যে সংসারের চাকায় বাঁধা এই সহজ কথাটাও তুমি জানো না?

ঃ সহজ বাঁধন ইচ্ছে করলে সহজেই কাটানো যায়।

বকুল পুতুলের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে বিদায় নেয়!

চোদ্দ

উমা ভাবে, কি করা যায়?

বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক হয় নি কিন্তু বাড়িতে হৈ চৈ হট্টগোল, আনন্দ উৎসব।

এ বাড়িতে বিয়ের উৎসব এই প্রথম হবে।

হরিপ্রসন্নের প্রথম মেয়ের বিয়ে।

চাকুরে মেয়ের বিয়ে।

চাকুরে ছেলের সাথে।

মেয়ের এমন জামাই পাবে হরিপ্রসন্ন ষাট বছর বয়সের জীবনে কোনদিন কোনকালে কল্পনা করতে পেরেছিল?

সামান্য খরচে পার হয়ে যাবে চাকুরে মেয়ে!

নগদ দিতে হবে না।

গয়নাও তাদের খুশিমত !

চাওয়ামাত্র উমার মা মেয়ের জন্য নিজের গলার হার, হাতের চুড়ি খুলে দেয়।

বাক্স খুলে অনেক যত্নে তুলে রাখা অনেকদিনের কানপাশা কানের দুল দিয়ে দেয়।

চেনা দোকানে এই ক'টা জিনিস ঘষা মাজা করে নতুনের মত করে আনতে গিয়ে চার্জ কত লাগবে শুনে হরিপ্রসন্ন চমকে যায়।

ঃ একটা কাপড় ধুতে চার্জ লাগে দু'আনা।

ঃ কাপড় কি সোনার গয়না দাদা ?

আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, দেশের পুরোনো পুরুতকে চিঠি দেওয়া হবে, না এখানকার কোন পুরুত ডাকা হবে সে কথা ভাবা হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন উমা বলে, বাবা, এসব বন্ধ কর।

ঃ বন্ধ করব কি রে ?

ঃ হ্যাঁ, বন্ধ কর। বিয়ে হয়ে কাজ নেই।

ঃ তুই কি আমাদের বাঁদর নাচ নাচাচ্ছিস ? সব ঠিকঠাক করলাম, এখন বলছিস বন্ধ কর !

উমা বলে, আমি কি করব ? চন্দরবাবুকে জিজ্ঞাসা করে এসো গিয়ে ব্যাপার কি। বিয়ে হলে চাকরি যাবে।

হরিপ্রসন্ন যেন আকাশ থেকে পড়ে।

ঃ চন্দর নিজে বলেছে ?

ঃ বলেছে বৈকি। তোমার চন্দরবাবু কোন ম্যারেড গার্লকে এই পোস্টে রাখবে না।

ঃ তাহলেই তো সর্বনাশ।

হরিপ্রসন্ন মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। তারপর মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করে, একবার যাব চন্দরের কাছে ?

ঃ না, গিয়ে কোন লাভ নেই। তুমি হাজার বললেও ওর মন ভিজবে না। এটা বলাবলি ধরাধরির ব্যাপার নয়। তুমি গিয়ে গণ্ডগোল করলে বরং আমার চাকরির ক্ষতিই হবে।

শুনে হরিপ্রসন্ন ঝিমিয়ে যায়।

ছেলের বাড়া মেয়ে।

ছেলে যে কোনদিন এত টাকা বেতনের চাকরি বাগাতে পারবে, হরিপ্রসন্ন তা কল্পনাও করতে পারে না।

যতই কড়াকড়ি করুক, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খাওয়াবার জন্য জেদ করুক, উমা চাকরিটা পাবার পর সংসারের শ্রী ফিরেছে।

ছেঁড়া অব্যবহার্য জামা-কাপড় দিয়ে চালিয়ে নিতে হয় না। দু'চার পয়সার মিল্ক্ পাউডার আনিয়ে সংসারের দুগ্ধপান এবং চা পানের প্রয়োজন মেটাতে হয় না।

প্রচুর না হোক, মাছ তরকারী দু'বেলা জোটে।

মুদীর দোকানে আজও দেনা আছে। কিন্তু মাসে মাসে উমা নিয়মমত কিছু কিছু দেনা শোধ করে আসছে বলে, সে মোটা মাইনের চাকরি করছে জেনেছে বলে, উমা স্লিপ পাঠালে বাকীতে দু'চার টাকার সওদা মুদীখানা দিচ্ছে।

মেয়ের এ চাকরি গেলে তাদেরও তো সর্বনাশ।

বিয়েই বরং স্থগিত রাখা যাক।

তাছাড়া উপায় কি?

আনন্দময় চিরদিন চুপচাপ। উমা যা বলেছে যা ঠিক করেছে তাই সে মেনে নিয়েছে।

বিয়ে করে নিজের একটা সংসার পাতার বদলে, চাকরি করে গিয়ে বাপ-ভাইয়ের সংসারটা চালিয়ে যাওয়াই শেষ পর্যন্ত উমা স্থির করবে, এটাও যেন তার জানাই ছিল!

বিনা প্রতিবাদে সিদ্ধান্তটা সে মেনে নেয়। উমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট তর্কও করে না।

শুধু বলে, চাকরি ছাড়া কি চলে? বিয়ের গণ্ডগোল বাধিয়ে চাকরি ছেড়ে কাজ নেই। তুমি আমি যেমন চালিয়ে যাচ্ছি তেমনি চালিয়ে যাই এসো! তারপর দেখা যাবে।

আনন্দময় শুধু সুকান্ত আর ভদ্র নয়—তার আনুগত্যের সহজ আন্তরিকতা উমার মর্ম স্পর্শ করে।

হয়তো আনন্দময় তাকে ভালবাসে।

সহিষ্ণুতাই তার নীরব প্রেমের চরম রূপ।

পনেরো

অনিলও কেমন বিগড়ে গেছে।

নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রথমে কান্তা ভেবেছিল, এটা চঞ্চলতা। তার সঙ্গে বিয়ে হবে, জীবনে এত বড় একটা স্টেপ নেবে, এইসব ভেবে অনিল একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দিন যায়, সপ্তাহ যায়, অনিল একবার খবর নিতেও আসে না কান্তা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে তাদের বিয়ের দলিল মঞ্জুর করে আনার তারিখ পর্যন্ত পার হয়ে যায়।

উমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কান্তা দু'একটা কথার পরেই জিজ্ঞাসা করে, অনিলের খবর কিছু জানিস?

ঃ এর কাছে ওর কাছে শুনেছি। হঠাৎ নাকি কি রকম পাগলাটে হয়ে গেছে। ড্রিঙ্ক করে আর খুব মাংস খায়। বাইরে মদ মাংস খেয়ে বেড়ায়, বাড়িতেও নাকি ওর জন্য একবেলা মাংস রাঁধা হয়। অনিলদা'র কি হল কিছুই বুঝলাম না। একটু থামে উমা।

ঃ মনটা সত্যি খারাপ হয়ে যায়। অন্য কোন উপসর্গ নেই, শুধু ড্রিঙ্ক আর হোটেলের দামী দামী ফুড।

সত্যি সত্যি বিগড়ে গিয়ে থাকলে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে জানিস না?

ঃ জানি বলেই তো মনটা খারাপ হয়ে যায়।

কান্তা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কড়া ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে, সোজাসুজি বল না কি ব্যাপার?

উমাও কড়া সুরে বলে, আমি কি জানি ব্যাপার? অনিল হঠাৎ বিগড়ে গেছে, রোজ হোটেলে গিয়ে মদ খাচ্ছে, এইটুকু মাত্র আমি শুনেছি। এটাও কিন্তু শোনা কথা— সত্যি-মিথ্যা জানি না।

ঃ কি করব বলতে পারিস?

ঃ কিছু না করাই তো আমার মতে ভালো। সিরিয়াস কিছু নিশ্চয় ঘটেছে। নইলে অনিলদার মত মানুষ এরকম কাণ্ড শুরু করে? না জেনে না বুঝে কিছু করতে গেলে হয়তো একেবারে উল্টো হবে।

কান্তা ধৈর্য ধরে থাকে।

উমার কথাই ঠিক। এ অবস্থায় চাপ দিলে হয়তো আরও বিগড়ে যাবে অনিলের মন।

কি হয়েছে জানা যাবে নিশ্চয়।

অনিল নিজেই তাকে জানাবে।

হিসাব ভুল হয় না কান্তার, পরের রবিবার সকালবেলা অনিল এসে হাজির হয়।

রোগাটে গড়ন ছিল অনিলের-- কী বিশ্রী হয়ে গিয়েছে তার চেহারা।

কান্তা তাকে বসতে বলে, তাড়াতাড়ি একটা ডিমের অমলেট আর চা তৈরী করে নিয়ে আসে।

অনিল বলে, রাগ করেছ?

কান্তা বলে, না। একটা কিছু ব্যাপার যে ঘটেছে সেটা বুঝতে পেরেছি।

ঃ ব্যাপারটাই তোমায় বলতে এলাম।

ঃ আগে এসে বলা উচিত ছিল না?

অনিল বলে, উচিত ছিল বৈ কি। সকলের আগে তোমাকে জানানোই উচিত ছিল। কিন্তু কি রকম বিব্রত হয়ে ছিলাম তুমি ধারণা করতে পারবে না।

কান্তা শান্ত সুরে বলে, কি নিয়ে বিব্রত হয়েছিলে?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুখ তুলে অনিল বলে, আমার টি. বি. হয়েছে।

কান্তা শুধু বলে, ও!

অনিল বলে, মরণের চরম পরোয়ানা—এবার আমায় মরতে হবে। বেশ, মরব। মরার আগে ক'টা মাস আমি তোমায় পেয়ে নিতে চাই।

কী কঠিন দেখায় কান্তার মুখ।

ঃ আমায় পেলেই মরা সহজ হবে? মরতে মজা লাগবে?

অনিল নির্বিকারের মত বলে, প্রাণের সাধটা মিটিয়ে মরছি এ সান্ত্বনাটা থাকবে। মরার আগে জেনে যাব ভালবাসা টি.বি-কেও গ্রাহ্য করে না।

কান্তা রাগে বলে, টি.বি. হলেই মানুষ মরে নাকি? কোন শাস্ত্রে লেখা আছে। আমায় কথা দাও বাঁচার চেষ্টা করবে, আমি তোমার বিয়ে করা বৌয়ের চেয়েও ওবিডিয়েন্ট হয়ে থাকব।

উঠে গিয়ে দরজাটা সে বন্ধ করে দিয়ে আসে।

অনিলের কোলে মাথা গুঁজে বলে, আমি তোমার হলাম। যখন চাইবে তখনি পাবে। কোন দায় নেই, কোন দায়িত্ব নেই। আমায় শুধু কথা দাও যে কঠিন রোগ হয়েছে বলেই মরণকে তুমি মানবে না, রোগ সারিয়ে বাঁচবার জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে।

ঃ আমার মুখের কথাই মানবে তুমি?

ঃ মানব। মুখের কথা তুচ্ছ করার সাধ্য তোমার নেই। কেন জানো? আমি বিশ্বাস করি না তুমি মরার কথা ভাবছ। বাঁচার জন্যই তুমি লড়াই শুরু করছ।

সলাজ হাসির সঙ্গে যোগ দেয়, বাঁচার জন্য বিষম লড়াই চালাতে হবে, প্রাণে আনন্দ চাই, হতাশা জাগলে কাটিয়ে দেবার মত মানুষ চাই, সেইজন্য আমাকে দরকার পড়েছে, না? বেশ তো, বাঁচার লড়াই চালাও, যখন চাও আমায় পাবে। আমার কি হবে, লোকে আমার কত নিন্দে করবে—ওসব হিসেব তুমিও ধরবে না, আমিও ধরব না।

অনিল একটু সংশয়ের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করে, আমার বাঁচার লড়াইয়ের সব হিসাব ধরতে পেরেছ?

কান্তা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, পেরেছি বৈকি। তোমার মুশকিল কোথায় জানি না? শুধু নিজের রোগের সঙ্গেই তো তোমার লড়াই নয়—দশটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়ও তোমার।

ঃ সে দায় খুশি হলেই এড়িয়ে যেতে পারি। মা বোন ভাইদের বাঁচানোর দায় মানতেই হবে এমন কোন আইন নেই।

ঃ আইন নেই কিন্তু দায় আছে। একটা দায় নিয়ে সেটা নিজের রোগের খাতিরে এড়িয়ে যেতে পার না বলেই তো তোমায় এত বিশ্বাস করি। আমি জানি, রোগ সারাবার জন্যও তুমি সকলকে ভাসিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারবে না।

সত্যই তো, আরও ঢের কম চেষ্টায় নিজের রোগ সারিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারত — যদি সে না হিসাব কষতে বসত অন্যদের বাঁচন মরণের প্রশ্নটা।

যেদিন খুশি বাড়িটা বেচে দেবার অধিকার তার আইন-সম্মত। বাড়ির লোকের কোঁদল আর কাঁদাকাটি করার বেশি কিছুই করার অধিকার কোনদিন ছিল না।

বাড়ি বেচে বারো চৌদ্দ হাজার টাকা পাওয়া যেত।

সকলকে ফেলে কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে চলে গিয়ে অসুখটাকে জয় করা যেত।

অতগুলি টাকাও লাগত না। আজকাল কত কম খরচে কী নিখুঁত চিকিৎসা ঠিক হয়েছে বুকে ফুটো হওয়া ব্যারামের।

এখন আর হাজার হাজার টাকার হিসেব কষা দরকার হয় না এ রোগ চিকিৎসা করে সারাতে।

সাধারণ জ্বর কাশি সামলাতে দেড় মাস লেগেছে মন্দাকিনীর। শরীরে যেন জোর পায় না।

রান্না-বান্নার দায়টা আবার নিয়েছে কিন্তু আগের মত একাই সব দায় সামলায় না। সুমতিকে প্রণতিকে ডেকে উনানে নিজের চাপানো রান্না নামানোর দায় ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

বলে যে ফ্যান শুষে এলে ভাতের হাঁড়ি নামাতে হবে--দেখতে হবে না ভাত গলেছে কিনা। অত সূক্ষ্ম হিসাবে তাদের দরকার নেই। ভাত গলার হিসাবেই সে জল দিয়েছে ভাতের হাঁড়িতে।

বলে, ডালটা হয়ে গেছে, শুধু সম্ভার দিয়ে নামা।

দুধ রাখা হয় দেড় পোয়া।

কে যে কতটুকু খাবে সে হিসাব রাখার দায়ও সুনীতি নিয়েছে।

বাড়িতে লোক কম নয়, বাচ্চা মোটে একটা, সুনীতির ছ'মাসের ছেলেটা।

তার জন্য ছটাকখানেক দুধ বরাদ্দ, বড়দের চায়ের জন্য আর এক ছটাক। বাকী দুধটা সে বলকা তুলে অনিলকে এক চুমুকে পান করায়।

দু' একবার খেতে চায় নি অনিল।

সুমতি নালিশ করেছে মন্দাকিনীর কাছে। মন্দাকিনী যেন ক্ষেপে গিয়ে তছনছ করে দিয়েছিল রান্নাঘর, তার তোরঙ্গে লাগানো তালা খুলে এনে রান্নাঘরের শিকল আঁটা দরজায় লাগিয়ে দিয়ে হুকুমের সুরে চেঁচিয়ে ঘোষণা করেছিল—আজ বাড়িতে সকলের চিড়ে দই জুটলে জুটবে—নইলে সকলের উপোস।

দুধের বাটিটা হাতে ধরাই ছিল সুমতির, অনিল সেটা টেনে নিয়ে একচুমুকে দুধটুকু গিলে ফেলে।

এক ঝলক দুধ উথলে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে মাছি আর পিঁপড়ে ভিড় করে ঢেকে ছেয়ে দেয় মেঝেতে ওতলানো দুধটুকুকে।

তার অসুখটা কি না জানলেও তার শরীরের অবস্থা দেখে বোনেরা উঠে পড়ে অনিলের সেবার ভার নিয়েছে।

রাগে জ্বলে যায় অনিলের প্রাণ। তবু সে সংযত ভাবেই বলে, এই একটু দুধ খাওয়ানোর দরদ দিয়েই বশ করবি? আমায় বাঁচিয়ে লাভটা কি হবে বল তো?

ঃ তুমি বাঁচবে, সেটাই আমার সেরা লাভ।

ঃ কেন? আমার বাঁচা-মরায় তোর কোন লাভ আছে? তোর কাছে আমার মরা-বাঁচা সমান কথা।

ঃ বড় বেশি সস্তা হিসেব শিখেছ। আমরা কি ওই হিসাব কষছি ? ওই হিসেব কষে দুধটুকু তোমাকে খাওয়াচ্ছি ?

মন্দাকিনী বলে, সোজা কথাটা বুঝিস নে তুই, যে তোর দেহটা ঠিক থাকলে তবেই আমার সংসার চলবে ?

ঃ বোঝা উচিত ছিল।

ঃ হয় স্বামী, নয়তো, রোজগেরে ছেলে—বেঁচেবর্তে থাকলে সব বজায় রইল, নইলে মেয়েদের সব ফুরিয়ে গেল। ওই তো ও বাড়ির রাখালবাবু রোগে ব্যারামে মরতে বসেছে, তবু ওর জ্ঞান নেই যে মেয়েদের পায়ের তলায় চাপতে পারার নিয়ম চালায় গুণ্ডারা, মেয়েদের ওপর ওই নিয়ম চালাতে গেলে নিজেকেও মরতে হবে।

বকুল মৃত স্বামীর ঘর-বাড়ি টাকা-পয়সার দখল নিয়ে বাকী জীবনটা ওই সংসারের দায় নিয়ে কাটিয়ে দেবার জন্য যেদিন রওনা দেবে, তার দিন চারেক আগে মুকুল ফিরে আসে।

দেহটা তার একটু ক্লিষ্ট দেখায় কিন্তু ভাবটা যেন তার গর্ব আর অহঙ্কারে ভরা।

স্নান করে এসে কপালে আর সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর লাগিয়ে সে মা-কে সরিয়ে দিয়ে তরকারি কুটতে বসে।

প্রশ্ন করে কেউ জানতে না চাইলেও নিজেই সাড়ম্বরে বর্ণনা করে তার ঘুরে আসার অভিজ্ঞতার কথা !

বকুলের শ্বশুরবাড়িতে ছিল মোটে দু'দিন।

ঃ দুদিনে ওলোট-পালোট করে দিয়ে এসেছি। ওরা বকুলকে ঠকাবার মতলব করেছিল, বকুল এদিকে বোকা হাবা ছেলেমানুষের মত একটা মহাপাপ করতে চলেছিল। আমি বুঝিয়ে বলতে ওদের চৈতন্য হল।

বকুলের দিকে চেয়ে বলে, খুব খাতির পাবি এবার।

বকুল চুপ করে থাকে।

মুকুল তরকারি কুটতে ওস্তাদ—তার রান্নারও সকলে প্রশংসা করে। বার বার চোখ তুলে সকলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটানা কথা বলতে বলতে সে বাঁধাকপি কুচি কুচি করে কেটে চলে।

বলে, ক'দিনে চার চারটে তীর্থ সেরে এলাম। কপালের জোর না থাকলে কি হয় ? শ্বশুরবাড়ি গেলাম, বাস্, গাড়ী ভাড়াতেই সব পয়সা গেল ফুরিয়ে।

মুকুল একটু হাসে।

ঃ আমায় দেখে উনি প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিলেন। এমন হঠাৎ গিয়ে হাজির হলাম তো। তারপর যখন বললাম যে আমি দু'একটা তীর্থে যেতে যাই, খরচার টাকা চাইতে এসেছি—তখন অন্যরকম হয়ে গেল মানুষটার মুখখানা।

সলাজভাবে মাথা নামিয়ে যেন তরকারি কোটাতেই মনোনিবেশ করে মুকুল।

সেইভাবে বলে, বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বলল, দু'দিন তবে থেকেই যাও

এখানে, একমাসের ছুটির দরখাস্ত করেছি—কাল পরশু মঞ্জুর হয়ে যাবে। দু'জনে এক-সাথে যাব—আমিও অনেকদিন বাড়ি থেকে বেরোই নি।

সগর্বে মাথা তুলে মুকুল বলে, একমাস আমরা দু'জনে ঘুরেছি - আজ এখানে কাল ওখানে। পুরীতে টানা আটদিন ছিলাম—সমুদ্র নাকি ওনার খুব ভাল লাগে। আমায় নিয়ে আর একবার দু'একমাসের জন্য পুরীতে যাবেন বলেছেন।

বকুল বোকার মত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে, তোকে তবে রাখল না কেন দিদি?

মুকুল বিচলিত না হয়েই জবাব দেয়, কি করে রাখবে? আর এক জনকে ঘরে এনে ফেলেছে, উপায় কি!

অনিলের রোগটা বাড়িতে মুকুল প্রথম আঁচ করে।

কিন্তু হৈ চৈ করে না।

তার তো কিছুই করার ক্ষমতা নেই। বিস্ময়কর সংযমের পরিচয় দিয়ে অনিলের কাছেও সে গোপন রাখে যে তার রোগের ব্যাপারটা সে আন্দাজ করতে পেরেছে। এ সংসারের নিয়ম রীতি মেনে নিয়ে সাধারণ সেবা-যত্ন একটু দরদের সঙ্গে করা ছাড়া তার আর কিছুই করার সাধ্য নেই।

একটু দুধ বেশি দেওয়া সম্ভব হলে কোনদিন আধখানা ডিম বেশি দেওয়া।

স্বামী তাকে সঙ্গে নিয়ে একমাস অনেক তীর্থ আর দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে এনেছে।

কিন্তু স্ত্রী হিসাবে, সংসারের কর্ত্রী হিসাবে তাকে গ্রহণ করে নি। এজগতে কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা বা অধিকার তার নেই।

খোকলা

বিনয়ের রকম যেন কেমন কেমন।

কেমন লঘু হয়ে গেছে তার মন মেজাজ। কেমন হাল্কা হয়ে গেছে তার কথাবার্তা, সবচেয়ে হাল্কা লাগে হাসিটা।

একটু হাসতে হবে বলেই অগত্যা সে যেন মুখে হাসি ফোটায়। একটু ইয়ার্কি করার মত।

হাসিহাসিও যে কত গুরুতর ব্যাপার জীবনে, কে এতদিন তা খেয়াল করেছিল? প্রাণ খোলা হাসি, প্রাণে কুতুকুতু লাগা হাসি, ভদ্রতার কাষ্ঠ হাসি আর অমার্জিত জীবনের প্রাণান্তকর বীভৎস রসিকতাকে প্রাণের জ্বালায় অবজ্ঞা করার ব্যঙ্গের হাসি—কে জানত এসব হাসির ওজন এত বেশি।

তুলোর মত ফাঁপা, পাখীর খসা সাদা পালকের মত বিবর্ণ প্রাণহীন হালকা হাসির নমুনা যদি না দেখা যেত বিনয়ের মুখে।

মুখে নয়, ঠোঁটে।

সমস্ত শরীরটা নাড়িয়ে মুখ চোখ বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে হো হো শব্দে প্রচণ্ড হাসিও বিনয় হাসত, উমা কান্তারা ব্যথিতা হয়ে ভাবত যে কী অসভ্য এই অদ্ভুত রকম প্রাণবন্ত মানুষটা। মুখে আমোদের ভঙ্গী ফুটিয়ে একটু বাঁকা চোখে চেয়ে বাঁকা তামাসার হাসি হেসে সকলকে সে হাসিয়েও দিতে পারত।

যতই রাগী আর বদ-মেজাজী হোক, যতই অসম্ভব হোক বিচার করা, কখন কেন সে রাগবে অথবা হাসবে, বরাবর মোটামুটি হাসিখুশিই মনে হয়ে এসেছে তাকে।

আজকাল একেবারে রাগে না।

মেজাজ অদ্ভুতরকম নরম হয়ে গেছে।

কিন্তু হাসিখুশিও তো মনে হয় না তাকে।

বকুলের জন্য তার মধ্যে এমন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হবে—বকুলের ব্যাপার যারা ভাল করে জানত তাদের মধ্যে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

নিজের মনে একা একা চুপচাপ আছে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই, হঠাৎ বস্তির সস্তা মেয়েমানুষের ঘরে গিয়ে বিনয় দিন-রাত্রির বেশির ভাগ সময় কাটায়।

সস্তা দেশী মদ গেলে।

বেপরোয়া হয়ে গেলে।

বাড়ি ফিরেও কয়েকদিন বাড়িতে সযত্নে রান্না করা মাছ তরকারি ডাল ভাত ছোঁয় কিনা সন্দেহ।

নিজের ঘরে বসে সস্তা মদের সঙ্গে কাঁকড়া, চিংড়িমাছ, মাংস চালিয়ে যায়।

সস্তা মদের সঙ্গে চালাবার জন্য বস্তা-পচা একগাদা মশলা দিয়ে মানানসই রান্না।

আগে হয়তো দেখেই বিনয়ের গা ঘিন ঘিন করত। আজকাল সে যেন বাড়িতে বিশেষ-ভাবে রান্না করা মাংস ডিম কালিয়ার চেয়ে কিনে আনা ওই সব অখাদ্য বেশি পছন্দ করে। বকুলের জন্য খাদ্য আর অখাদ্য সম্পর্কে রুচিও যেন তার বিপরীত হয়ে গেছে।

অনিল বলে, কি আরম্ভ করছিস ?

বিনয় বলে, আরম্ভ নয়—শেষ করছি।

ঃ কি শেষ করছিস ? নিজেকে ?

ঃ না। নিজের বোকামি হাবামির পালা।

ঃ নিজেই তো শেষ হয়ে যাবি।

ঃ সেটা সামলে নেব। মনের আবর্জনাগুলি আগে পুড়িয়ে সাফ করে নিচ্ছি।

কান্তা অনিলকে জিজ্ঞাসা করে, এর মানেটা বুঝিয়ে দিতে পার ? এই কি ব্যর্থ প্রেমের প্রতিক্রিয়া ?

অনিল বলে, না। কি জানি। হয়তো তাই। তবে আমার মনে হয় এটা হল হেরে যাবার জ্বালা সইতে না পারা।

তারপর একদিন বিনয় বিছানা নেয়।

যন্ত্রণায় ছটফট করে।

ডাক্তার এসে ইনজেকসন দিয়ে তার যন্ত্রণা বোধ করার শক্তি সাময়িকভাবে হরণ করে, অন্যান্য বিধানও দিয়ে যায়।

কান্তা খবর নিতে এসে জিজ্ঞাসা করে, প্রেমের অজুহাতে যা খুশি তাই করা চলে, না ?

বিনয় শীর্ণ মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলে, প্রেমের অজুহাতে নয়। অনেকদিন থেকে সখ ছিল—দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে হৈ চৈ করে দেখব কেমন লাগে।

কান্তা কড়া শাসনের সুরে বলে, বাজে বকো না। বকুল যেই চলে গেল, অমনি তোমার অনেকদিনের সখের পালা শুরু হল! এরকম বোকামি করার কোন মানে হয় ?

ঃ মানুষ কি জেনে বুঝে বোকামি করে ?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার সাধ্য কান্তার ছিল না। সে অগত্যা বিদায় নেয়।

দুপুরবেলার মেঘলা আকাশ। দারুণ গুমোট সকলের গায়ের ঘাম ঝরিয়ে চলেছে।

অনিল এসেছে শুনেই বিনয় টের পেয়েছিল, এ সময় সে এসেছে মানেই গুরুতর কিছু বলতে এসেছে।

তার সম্পর্কেই নিশ্চয়। গুরুজনের মত অহংকার করার জন্য না হলেও অনিল তাকে বড় বেশি উদ্দেশ্যমূলক কথা শোনায়।

অনিল কিন্তু আজ নিজের কথা দিয়েই শুরু করে।

নিজের বুকে টি. বি-র ঘা হওয়ার মারাত্মক সংবাদ শুনিয়ে তাকে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে অনিল তার পেটের খবর জিজ্ঞাসা করে।

বিনয় বলে, আমার পেট ঠিক হয়ে গেছে, আবার নষ্ট না করলেই হল। কিন্তু তোর বুকের ব্যাপারটা কদ্দিন হল ?

ঃ বছরখানেক হল।

ঃ গোপন করেছিস কেন ?

ঃ বাড়িতে গোপন করেছি—ডাক্তারের কাছে নয়। বাড়িতে জানিয়ে লাভ কি হবে ? সবাই ভড়কে গিয়ে আমার দফা নিকেশ করে দেবে। রোগা হয়ে যাচ্ছি বলে ডিম দুধ যতটা পারে খাওয়াচ্ছে।

ঃ তোর পয়সাতেই খাওয়াচ্ছে।

ঃ সোজা কথা গুলিয়ে ফেলিস কেন বল তো ? মেয়েরা পুরুষকে পুরুষের পয়সাতেই খাওয়ায়। একটা কানাকড়ি পয়সা মেয়েদের আছে যে নিজেরা পুরুষকে খাওয়াবে ? রোগটা তো গোপন করেছি সেইজন্য—মুষড়ে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে দেবে। তুই কিন্তু সাবধান—পেটের আলসার আকাশ থেকে অকারণে আসে না। ভালভাবে পেটটা পরীক্ষা করাস।

ঃ আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না !

ঃ কেন মিছে কথা বলছিস, উল্টো কথা বলছিস ? বাঁচার চেয়ে মজা নেই। আমি

ফুসফুসে টের পেয়েছি—তুই পেটে পেটে জানিস। না বাঁচলে চলে? বাঁচাই ফল আসল কথা।

ঃ তুই তবে মরছিস কেন?

ঃ বড় হাঙ্গামা। ভাল লাগে না। ওষুধ-পথ্যের ওপর নির্ভর করে কতকাল কাটাতে হবে কে জানে।

ঃ তাতে দোষ আছে কিছু? ওষুধ খেতে, গা ফুঁড়ে ওষুধ নিতে কতক্ষণের হাঙ্গামা? ছিভের সুখটুকু বাদ দিয়ে ভাল পুষ্টিকর জিনিস খেতে কষ্ট কি? অনেকগুলি দিনরাত্রি বাঁচার জন্য ওটুকু না করলে চলে?

দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

সতেরো

দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন সুনীলও আজকাল এক রকম আসেই না।

পরীক্ষা নিয়ে যখন ব্যতিব্যস্ত ছিল তখনও দু'চার দিন পরে পরে এসে সে তাদের খবর নিয়ে যেত, তনিল এবং বাড়ির লোকের সব রকম খুঁটিনাটি খবরও নিয়ে যেত।

পরীক্ষা দেবার পর কয়েকদিন পাত্তা মেলেনি—দেখে মনে হয়েছিল খুব মুষড়ে গেছে।

কান্তা ভেবেছিল, আবার পরীক্ষায় খারাপ করেছে।

ভেবে তার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই মুষড়ানো ভাবটা কাটিয়ে উঠে সুনীল দিনে দু-তিনবার তাদের বাড়ি গিয়ে আড্ডা জমাতে শুরু করলে কান্তা স্বস্তি বোধ করেছিল। ভেবেছিল, সুনীলের মুষড়ানো ভাবটা পরীক্ষা খারাপ হওয়ার জন্য দেখা দেয়নি, পরীক্ষা দেবার শ্রান্তি আর ক্লান্তিতে বেচারা ঝিমিয়ে গিয়েছিল।

দু'বার গ্র্যাজুয়েট হবার চেষ্টা করে এবারও বিফল হয়ে তার প্রচণ্ড বৈরাগ্য জন্মেছিল।

সমাজ সংসার বিষাক্ত মনে হয়েছিল।

ভাগ্যে তার মনে হয় নি যে বেঁচে থাকাই অর্থহীন।

মরে যাওয়া ঢের ভালো।

অর্থাৎ আত্মহত্যা করে বসলে ছেলেকে সামলাবার জন্য তার বাপ দাদা ভাই বোনের প্রাণপাত চেষ্টা করার কোন মানেই থাকত না।

জোয়ান ছেলের বৈরাগ্য সামলানোর চেষ্টা করা যায়।

মরা ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসা ছাড়া কোন কিছু করার থাকে না।

বুদ্ধি দিয়েছিল কান্তা।

ভর দুপুরবেলায় তার কাছে বিদায় নিতে আসা মাত্র সে টের পেয়েছিল তার মানসিক অবস্থা।

সুনীল সকালেই টের পেয়েছিল যে আবার ফেল করেছে। ভাগ্যে অন্য সকলে বাড়ি ছিল না!

ছুটির দিন বলে দল বেঁধে সবাই মিলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

ওটা ওরা বরাবর করে আসছে। কান্তাকে বাড়ি পাহারা দিতে রেখে গিয়ে সবাই মিলে সিনেমায় যায়।

সিনেমা দেখার জন্য কী টানটাই যে জন্মেছে ঘরে ঘরে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ীর মনে!

সুনীল এসে একটা অদ্ভুত রকম বেপরোয়া ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়ায়।

ঃ আবার ফেল করে গেলাম কান্তাদি।

ঃ কী কাণ্ডই যে তুমি করছ! যাকগে, বসো দিকি একটু। এমন হুট্ করে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুখবর শোনাতে আছে?

ঃ খবরটা বলে যেতে এলাম।

কান্তা চমকে ওঠার ভঙ্গি করে বলে, বুঝেছি ব্যাপার। খবরটা বলে কোথাও চলে যাবার ফন্দি এঁটেছ। তা সে বুদ্ধি মন্দ নয়। মনের ঘেন্নায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ক'দিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে এলে মনটা ঠিক হয়ে যায়। বিষ-টিষ খেয়ে হাসপাতালে গিয়ে কেলেঙ্কারি করার চেয়ে সেটা অনেক ভাল। দেশ বেড়ানো হয়, অভিজ্ঞতা বাড়ে, মনটাও ঠিক হয়—দশজন যারা ভালবাসে তাদের ভালবাসার মানটাও রাখা হয়।

মাথা ঘুরে যেন পড়ে যাবে এমনিভাবে সুনীল হঠাৎ পুরোনো খাটেই বসে পড়ে। বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করে, তুমি জানলে কি করে কান্তাদি?

কান্তারও বুক কাঁপছিল, পা কাঁপছিল, থর থর করে কাঁপছিল। তবু সে সহজ-ভাবেই বলে, আহা, এটা জানা যেন খুব কঠিন ব্যাপার! এককোঁটা দরদ থাকলেই জানা যায়। সেদিন বলছিলে না, দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে ধরেই নেওয়া যায়, বৌদির মত আমাকে ভালবাসো? ফেল করার খবরটা আমাকে জানিয়ে বিদায় নিতে এসেছো—তার মানেও বুঝতে পারব না? সংসারে এতদিন তবে দেখলাম কি, শিখলাম কি!

সুনীল বলে, একেবারে অপদার্থ আমি।

কান্তা বলে, পরীক্ষায় মানুষ ফেলও করে, পাসও করে। সেজন্য এমন উতলা হতে হয় নাকি?

সুনীল মরিয়া মানুষের মত শান্তভাবেই বলে, সংসার চালাতে, আমাকে পড়াতে দাদার বুকে আলসার হয়েছে। তবু আমি আবার ফেল করে গেলাম!

কান্তা বলে, অনিলের বুকে আল্‌সার হয়েছে এটা আমাদের সবারই ভাবনার কথা। কিন্তু তোমায় পড়াতেই কি ওর বুকে এই কাণ্ডটা হয়েছে? ওর দায় ও পালন করার চেষ্টা করেছে, তুমিও পাস করার চেষ্টা করেছ—পারলে না, করবে কি?

একটু থেমে কান্তা বলে, সব কাজ সকলে করতে পারে না, এই সোজা কথাটা খেয়াল রেখো। সেজন্য কেউ অমানুষ হয়ে যায় না—বাঁচার মানে ফুরিয়ে যায় না। গান-বাজনায় যার মস্ত বড় ওস্তাদ হবার ক্ষমতা আছে, স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় হয়তো সে হাজার বার ফেল করে যাবে। পরীক্ষায় পাস করাটাই কি মানুষের একমাত্র গুণ?

সুনীল গুম খেয়ে থাকে।

কান্তা বলে, কী বিষ যোগাড় করেছ বল তো? কলেজের কড়া বিষ, না দেশী সস্তা বিষ? এক কাজ কর, ওটা আমায় দিয়ে দাও। বেশ তো, বেশ তো, আমার কাছেই নয় জমা রইল। ফিরে এসে চাইলেই ফেরত দেব।

সায়ানাইডের মোড়কটা সুনীল নীরবে তার হাতে তুলে দেয়। জমিয়েছে কি না কে জানে, বড় ডোজ এনেছে। এর সিকিভাগ খেলে কারও সাধ্য হত না তাকে বাঁচায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে রক্ত জমে মরে যেত।

সিনেমা দেখতে না গিয়ে নমিতা বাড়ি থাকলে আজ কী সর্বনাশ কাণ্ডই যে ঘটত! সুনীল নমিতাকে ফেল করার খবরটা জানিয়ে যথারীতি বিষাদ ও হতাশার নাটকীয় ভাবের মধ্যে বিদায় নিত—তার ভাবসাব রকম সকম দেখেও বোকা মেয়েটা টের পেত না সে ভয়ানক কিছু করার কথা ভাবছে।

নমিতা বাড়ি থাকলে সে-ও গরজ করে সুনীলকে ঘরোয়া আদরে বসিয়ে কথাবার্তা শুরু করত না।

তার নিজের ঝনঝাট কি কম!

সকলের রোগ ব্যারাম সাংসারিক ঝনঝাটের দায় নিয়েছে।

সবটাই যেন ছেলেমানুষী ব্যাপার, সে নিজেও যেন মস্ত ডাক্তার মানুষ, এমনিভাবে কান্তা বলে, মরতে কতক্ষণ লাগে? মরলেই ফুরিয়ে গেল। তার চেয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে যাওয়া ভাল—ব্যাপারটা বোঝার সুযোগ পাওয়া যায়। পরীক্ষায় ফেল করে তুমি স্যুইসাইড করলে দাদার দশাটা কি হবে ভেবেছ?

ঃ দাদার জন্যেই তো!

ঃ দাদার জন্যে! পাগল না হলে কেউ এমন উল্টো কথা ভাবে? দাদার জন্য তুমি স্যুইসাইড করলে দাদাকেও স্যুইসাইড করতে হবে না? সে কথাটা বুঝি ভাবোনি? স্যুইসাইড তোমার একচেটিয়া ব্যাপার জেনে রেখেছ?

আঠারো

পরদিন থেকে মেঘলা দিন শুরু হয়। ভোর রাত্রে এক পশলা বর্ষণের পর আকাশে মহাসমারোহে চলে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ গাদা করার আয়োজন—মাটির ধারাবর্ষণ বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে।

এত চেষ্টাতেও তবু সারেনি !

শুকনো কাসি একটু ছিল। ঠিক কফ্। তোলা কাসিও যেন নয়—গলা খসখস করে একটু খুক্‌খুক্ করা।

শেষ রাত্রের বৃষ্টির হঠাৎ লাগা ঠাণ্ডাতেই কি আবার রক্তমাখা কফটুকু উঠল।

মৃত্যুর লাল পরোয়ানার ঈষৎ রঙিন একটু শ্লেষ্মা ?

ভালই হয়েছে ঠাণ্ডা লেগে।

খবরটা জানা গিয়েছে পষ্টাপষ্টি।

মাথাটা এমন ঝিম ঝিম করে ওঠে কেন ? সর্বাঙ্গ অবশ অবসন্ন হয়ে আসে কেন ? এত তার মরণের ভয় ?

এই মেঘ বাদল মাথায় করে কান্তা এত সকালে আসবে কে ভাবতে পেরেছিল !

ঃ মুখের চেহারা এমন হয়েছে কেন ? ও, সুমতির জন্য রাত জেগেছে। কেমন আছে সুমতি ? ওর খবরটাই জানতে এলাম।

ঃ ব্রঙ্কাইটিস—একটু জবর রকমের। নিউমোনিয়ায় গিয়ে না ঠেকলে কোন ভয় নেই।

ঃ নিউমোনিয়ায় গিয়ে ঠেকবে কেন ? তুমি ডাক্তারি না শিখেও মস্ত স্বাস্থ্যবিদ—তুমি বাড়তে দেবে কেন অসুখ ?

একটু ম্লান হাসি হেসে অনিল বলে, সেই কথাই ভাবছিলাম। একটা সোজা সরল কথা এতকাল জানতাম না—রোগ শুধু রোগের জীবাণুর জন্য হয় না। আরও অনেক—অনেক কারণ থাকে। শুধু ওষুধেও তাই রোগ সারে না।

ঃ কিন্তু ওষুধ ছাড়াও তো রোগ সারে না ?

ঃ নিশ্চয় সারে না। আমি কি ওষুধের নিন্দা করেছি ? চিরদিন তুমি আমার কথার উল্টো মানে বুঝে আসছ—তাই তো তোমার সঙ্গে বনে না, খালি তর্কই সার হয়। আমি বলি একভাবে, তুমি নাও আর একভাবে।

একটু থেমে সে আবার ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আমি কি পাগল না কাপালিক সন্ন্যাসী যে বলব—রোগ হলে ওষুধের দরকার নেই, ওষুধপত্র বাজে ? আমি কি জানি না হাজার হাজার বছর ধরে কত মানুষ রোগ সারাবার ঠিকমত ওষুধ বার করার জন্য জীবনপাত তপস্যা করে গেছে—আর সেইজন্যই যে রোগ আগে সারানো যেত না সে রোগও আজকাল সারানো যাচ্ছে ?

অনিল উঠে বসে।

ঃ ওষুধের নিন্দা করি নি। বলছিলাম অন্য কথা। একজন রোগীকে তেষ্টার জল পর্যন্ত না দিয়ে শুধু পেনিসিলিন দিয়ে গেলেই কি তার রোগ সারবে ?

ঃ পেনিসিলিন যারা দেয় তারা কি পাগল, তেষ্টার জল পর্যন্ত বন্ধ করে শুধু পেনিসিলিন দেবে ?

অনিল হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমিও তাই বলছিলাম। অবস্থা যখন অন্য সব কিছু ভেস্তে দিচ্ছে তখন শুধু ওষুধে কি ফল হবে ? ওষুধ ভাল, ওষুধ যারা দেয়

তারাও খাঁটি মানুষ—কিন্তু অন্যরকম অনেক কিছু যে আমার দফা নিকেশ করে দিচ্ছে, ওষুধে তার প্রতিকার নেই।

কান্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে।

সুনীলকে দেখে আর তার দু'একটা কথা শুনেই সে তার প্রাণের মারাত্মক আত্মঘাতী হতাশা টের পেয়েছিল—অনিলের মধ্যেও তেমনি ভয়ঙ্কর হতাশা সে টের পায় কিন্তু অনিলের শান্ত নিরুত্তেজ ভাব। তার এ ভাব সে কখনো দেখেনি। একটা মরিয়া ভাবের সঙ্গে গভীর হতাশা মিশে তাকে ধীর শান্ত করে দিয়েছে।

বাড়ির মানুষেরা একে একে উঠছে, প্রাতঃকৃত্য সারছে কিন্তু মেঘলা রাতের মতই সমস্ত বাড়িটায় একটা অদ্ভুতরকম নিঝুম ভাব—প্রাণের কোন সাড়া টের পাওয়া যায় না।

কান্তা তখন ভেবে-চিন্তে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে, সকাল বেলাই তোমার এমন হতাশা ভাব ?

অনিল মাথা নেড়ে বলে, কই না তো? চোখ-কান বুজে আসা আঁকড়ে থাকাই একমাত্র ভরসা—বোকার মত আমি হতাশ হব ?

ঃ কেমন যেন লাগছে তোমাকে আজ।

ঃ আমি একটা বিষম কথা ভাবছি কি না, তাই এরকম লাগছে। তোমাকে নিয়েই ভাবছি।

ঃ আমাকে নিয়ে ?

ঃ হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে।

ঘর বলা যায় না, খোলা ছাদের চিলে কোঠা। একান্তভাবে নিজস্ব একটি শোয়া বসার ঘর চেয়েছে বলেই নয়, এই কুঠরিতে আলো বাতাস অপর্যাপ্ত।

অবশ্য বৃষ্টিও ঢোকে। মাঝে মাঝে কোণে রাখা বই-খাতা কাগজ-পত্রের র‍্যাকটা ছাড়া সারা ঘর ভিজিয়ে দেয়।

সবার ছোট প্রণতি বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের চা এনে দেব দাদা ?

ঃ দে।

ঃ শুধু চা দেব, না আর কিছু ?

কান্তা বাইরে গিয়ে হাসিমুখে বলে, থাবড়া দেব, নয় তো কান মলে দেব বলছি প্রণতি। আমি এসেছি সুমতির অসুখের খবর নিতে—তোদের ভদ্রতার খাবার খেতে এসেছি ?

প্রণতি বলে, খাবার তো নয়, দু'মুঠো মুড়ি কিম্বা একটা টোস্ট। খালি পেটে সবাই তো চা খেতে পারে না।

কান্তা যেন খুশিতে ফেটে পড়ে বলে এর মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছিস বোন ? বেশ, বেশ। তাহলে দু'কাপ চা আর দু'মুঠো মুড়িই এনে দে, আমরা দু'জনে মজা করে খাই।

আগে থেকে সব কিছু বোধ হয় মোটামুটি তৈরীই ছিল। কারণ কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রণতি এক বাটি তেল নুন মাখা ভাজা মুড়ি আর দু'কাপ চা তাদের এনে দেয়।

অনিলকে বলে, দিদির জ্বরটা এখন কম।

: কত রে?

: একশ'র নিচে নেমেছে। আর একটু বেলায় বোধ হয় একেবারে রেমিশন হয়ে যাবে।

অনিল তেল-মাখা ভাজা মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে, তাহলে তো বাঁচা যায়।

প্রণতির বয়স এগারো পেরিয়েছে। তেমন বাড়ন্ত নয় বলে এখনো ফ্রক পরে এবং খুব বিশ্রী লাগলেও জানে আর মানে যে আরও দু'তিন বছর তাকে ফ্রক পরেই চালিয়ে যেতে হবে। শাড়ীর ব্যবস্থা হবে না—যদিও তার চেয়ে কমবয়সী, তার চেয়ে বেঁটে খাটো মেয়ে শাড়ী ব্লাউজ পরে সেজেগুজে স্কুলে আসে।

গোটা দুই সাধারণ ফ্রক আর ইজের হলেই তার চলে যায়।

শাড়ীর দাম বেশী।

শুধু তাই নয়। শাড়ীর সঙ্গে সায়া ব্লাউজ দরকার হয়--লাগসই সায়া ব্লাউজ।

প্রণতি ভারিক্কী বয়সের গিন্নিবান্নীর মত বলে, দিদির জন্য ভেবো না। দিদির ম্যালেরিয়া হয়েছে।

: তুই দেখছি ডাক্তার হয়ে উঠেছিস!

: ডাক্তার হতে হয় নাকি? কাঁপিয়ে জ্বর এল, তারপর ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেল—ম্যারেরিয়া ছাড়া এরকম জ্বর হয়?

: ও!

প্রণতি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না। ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অনিল জিজ্ঞাসা করে, বাড়িটা কেমন চুপচাপ হয়ে আছে খেয়াল করেছ? রোজ ভোর হতে না হতে চেঁচামেচি হৈ চৈ শুরু হয়, আজ কারো সাড়া শব্দ নেই।

কান্তার গলা কেঁপে যায়।

: সুমতির ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য তো এরকম হওয়ার কথা নয়। জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছে। সুনীল কিছু করে বসে নি তো?

: সুনীলের জন্যই তো।

কান্তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রায় অস্ফুটস্বরে সে বলে, বিষটা তো আমি আদায় করে নিয়েছিলাম। আবার যোগাড় করে আনল।

অনিল আশ্চর্য হয়ে বলে, বিষের কথা কি বলছ? বিষ তো খায় নি সুনীল, কাল বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।

কান্তা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

একটু গর্বের সঙ্গেই সে অনিলকে সুনীলের কাছ থেকে মারাত্মক বিষ কেড়ে নেওয়া এবং তাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেওয়ার কাহিনী শোনায়।

অনিল অভিভূত হয়ে শোনে।

খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে ধীরে ধীরে বলে, তোমার বাস্তব বুদ্ধি আছে জানতাম, এতটা যে আছে তা জানা ছিল না। তুমি ঠিক ধরেছিলে, অন্য কোন সদুপদেশে কাজ

হত না। প্রাণ বাঁচানোর উপায়টা বাতলে দিয়েছিলে বলেই বোধ হয় ওর স্যুইসাইড ঠেকানো গেছে।

কান্তা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যেখানেই যাক, যাই করুক, আবার ফিরে আসবে। এই বয়সে কেন যে মরে গিয়ে সব কিছু ঝনঝাট এড়িয়ে যাবার ঝোঁক চাপে!

ঃ অন্য পথ খুঁজে পায় না বলে।

সেটা কান্তারও জানা ছিল।

এমন আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে সুনীল কান্তার পরামর্শ গ্রহণ করেছিল যে অন্য অবস্থায় ব্যাপারটা একটু হাস্যকরই ঠেকত। কিন্তু কান্তার জানা ছিল যে সুনীলের বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা। অন্য কোন উপায় খুঁজে পায়নি বলেই দাদাকে অন্তত পক্ষে তার দায় থেকে রেহাই দিতে আর নিজে সমস্ত লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতে একেবারে ইহজগত ছেড়ে চলে যাবার সঙ্কল্প স্থির করেছিল।

ওই বিষ সে খেত এবং যথারীতি মরত।

কান্তা সহজ লাগসই উপায়টা বাতলে দিতেই সে তাই দ্বিধা করে নি. বিষটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, তাই তো, এটা আমার খেয়াল হয় নি। দাদার বোঝা না বাড়িয়ে কোথাও চলে গেলে সত্যিই তো হাঙ্গামা চুকে যায়!

কান্তা মনে মনে রেগে ভেবেছিল, সংসারের হাঙ্গামা যেন এত সহজেই চুকিয়ে দেওয়া যায়।

ঃ যেখানেই থাকো, মাঝে মাঝে একটা কার্ড লিখে আমায় খবর দেবে তো?

ঃ কোথায় আছি, কেমন আছি, এসব খবর দিতে পারব না। কিছু যদি করতে পারি তাহলে খবর দেব।

সকলের চোখের সামনে দিয়ে সুনীল সকালবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল. কেউ বুঝতেও পারে নি যে সে কোন ছোটখাট সাধারণ ব্যাপারে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছে না।

হাতে ছিল শুধু খবরের কাগজে মোড়া একটা পুঁটলি—সকলে ভেবেছিল সে বোধ হয় লন্ড্রীতে দেবার জন্য ময়লা জামা-কাপড় নিয়ে যাচ্ছে।

পিসি জোর গলায় বলেছিল, বাজারটা এনে দিতে হবে—মুকুল বলছিল।

ঃ আসছি।

'যাই' বলে নয়, 'আসছি' বলে যথারীতি বিদায় নিয়েই সুনীল যেন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

পিসির আপসোসের সুরটা তাই দাঁড়ায়ঃ 'আসছি' বলে চলে গিয়ে বাছা আমার এল না গো!

নিতান্তই সাধারণ ঘটনা।

প্রতি বছর পরীক্ষার ফল বার হবার পরেই যে কয়েকটি পরিবারে ঘটে থাকে তাও নয়, সারা বছর কলহ বিবাদ অন্যায় অবিচার এবং অতিরিক্ত শাসনের ফলে মাথা

গরম অমন অনেক ছেলে ঘর ছেড়ে পালায়। তবে খুব সহজে ও সস্তায় মরে যাওয়ার পথটা যে বেছে নিয়েছিল তাকে এই পথের সন্ধান দিয়েছে কি না, কয়েক ঘন্টার মধ্যে যে নিশ্চয় নিজের মরণ ঘটাত তার প্রাণটা বাঁচিয়েছে কিনা, কান্তার কাছেও ব্যাপারটা তাই অসাধারণত্ব লাভ করেছে।

সুনীল তার সঙ্গে দেখা না করে সোজাসুজি বাড়ি ছেড়ে গেলে সে হয়তো গ্রাহ্যই করত না বাড়ির লোকের প্রতিক্রিয়া, লক্ষ্য করার সাধও জাগত না, সময়ও হত না।

খবর শুনে প্রাণটা শুধু জ্বালা করত।

প্রায় একমাস সুনীলের কোন খোঁজ-খবর মেলে না।

নিজের ইচ্ছায় নয়, সদিচ্ছাপরায়ণ আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শের চাপে অনিল যথারীতি বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হলে প্রত্যেকটি লাইনের জন্য পয়সা গুণতে হয়- যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সুনীলকে উদ্দেশ্য করে জানায় যে পরীক্ষায় পাস করা ফেল করা অতিশয় তুচ্ছ ব্যাপার। সেজন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে সকলকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রাখা উচিত নয়। টাকার দরকার হলেই যেন সুনীল পত্র লেখে।

সুনীলের জন্য অনিল এবং তার পরিবারের ব্যাকুলতা কান্তার কাছে নাটকীয় রকমের হাস্যকর মনে হয়। সুনীলের পাগলামী সংশোধনের জন্য তারাই কোথায় কঠোর হবে, পরীক্ষায় পাশ ফেলের ঝনঝাট না পোহালে তাকে নিজের পথ বেছে নেবার সুযোগ দেবে, ছেলেটা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে বলেই যেন তাদের সকলের ধাত ছেড়ে গেছে।

নিজেকে মেরে ফেলার দুর্বুদ্ধিটা সুনীল যদি খাটাত, সে যদি না কায়দা করে আদায় করে নিত মারাত্মক বিষের মোড়কটা— বাড়ির লোকেরা ক'দিন শোক করত কে জানে!

এত নিখুঁত হিসেব কষেও প্রাণ কিন্তু শান্ত হয় না কান্তার।

বিষ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু চলন্ত রেল গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝোঁক তো সে সামাল দিয়ে দেয় নি।

হতাশার সঙ্গে দুঃখ-দুর্দশা মিশে মরিয়া করে তুললে আত্মঘাতী হবার পথ খুঁজে নিতে কতক্ষণ লাগে—ঝোঁকটা যদি চাপে?

মাসখানেক পরে সুদূর পশ্চিমের এক শহর থেকে সুনীলের সম্পর্কে টেলিগ্রাম এসেছে শুনেই সে তাই পরম স্বস্তি বোধ করে।

সুনীল হাসপাতালে পড়ে আছে।

তার অবস্থা খুব কাহিল।

এরকম একটা টেলিগ্রাম এসেছে শুনেও কান্তার মত অন্য সকলেও স্বস্তি বোধ করে।

মরার সহজ কোন পথ সুনীল বেছে নেয় নি। কান্তা রীতিমত খুশি হয় যে সে তার পরামর্শের মর্যাদা রেখেছে।

হাসপাতালে যাওয়া আলাদা কথা।

জোয়ান মন্দ ছেলে, পয়সা-কড়ি সম্বল না করেই দেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছে, কবে কোথায় কি খেয়েছে আর কোথায় পড়ে থেকেছে ঠিক নেই,— মরে না গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে যে হাসপাতালে পেঁাচেছে এটাই তো পরম ভাগ্যের কথা।

কান্তা অনিলকে বলে, চুপচাপ ছিলাম বটে কিন্তু আমিও ভেবে মরছিলাম। আমার পরামর্শে ছেলেটা বাড়ি ছেড়ে পালাল, আর কোন খোঁজ-খবর নেই। আমার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে পার ?

সবরকম চিন্তা-ভাবনা ব্যাকুলতা চাপা দিয়ে রেখে ধীর শান্ত নির্বিকার ভাবটা বজায় রেখে চলা অনিলের প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

সে বলে, যদি মরে যায় ? গিয়ে যদি দেখি বেঁচে নেই ?

কান্তা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত রেখে বলে, যদির কথা বাদ দাও। নিজেই যাবে ভাবছ নাকি ?

: কাকে পাঠাব বল ? আমার আর কে আছে ?

: তুমি বললে আমি যেতে পারি।

: সব ঝক্কি সামলাতে পারবে ?

: পারব না কেন ? আমি কচি খুকি না ঘরের কনে বৌ ?

অনিল প্রাণহীন কৃতজ্ঞতার সুরে বলে, তাহলে আমাকেও বাঁচিয়ে দেবে। অফিসে গণ্ডগোলের জেরটা মিটছে না, আবার জট পাকাতে শুরু করেছে। এসময় দু'চার দিনের ছুটি নেওয়াও বিপদ।

কান্তা জোর দিয়ে বলে, তুমি ঘর আর অফিস সামলাও, আমিই গিয়ে বাঁদরটাকে ফিরিয়ে আনছি। টাইম-টেবিল আছে ? বাড়িতে না থাকলে পাড়ার কারো বাড়ি থেকে চেয়ে আনো। যাতায়াতে কত খরচ লাগবে হিসাবটা কষে ফেলি এসো।

অনিল বলে, শুধু যাতায়াতের হিসাব ? তোমার হয়তো কয়েকদিন থাকতে হবে, বাঁদরটার চিকিৎসার টাকা দিতে হবে -

কান্তা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, সেই জন্যেই তো দু'জনে বসে খরচার হিসাবটা কষে ফেলব বলছি। তুমি নিজে গেলে কি হিসাব করতে না কত টাকা সঙ্গে নেওয়া দরকার ?

অনিল ম্লান মুখে বলে, খরচের হিসাব মোটামুটি করি নি ভেবেছ নাকি ? টেলিগ্রাম পেলাম আর হাজার কয়েক টাকা পকেটে নিয়ে ভাইকে ফিরিয়ে আনতে ছুটে গেলাম, সেরকম বড়লোক তো আমি নই !

কান্তা তাকে সাহস দিয়ে বলে, টাকার জন্য ভেবো না। আমারও তো বেড়ানো হবে, আমিও যা পারি দেব। দু'জনে মিলে খরচটা দিলে কারো গায়ে লাগবে না। আগে হিসাবটা কষে ফেলি এসো।

অনিল আশ্চর্য হয়ে বলে, সুনীলের জন্য তোমার এত মমতা ?

কান্তা সহজভাবেই জবাব দেয়, সুনীলের জন্য নয়। অপঘাত থেকে দেশের একটা ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছি—এই নিয়ে অহঙ্কার করার জন্য।

অনিলের ম্লান বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি দেখা যায়।

আশার হাসি।

আনন্দের হাসি।

আশা ছাড়া তো আনন্দ নেই।

পশ্চিমের সুদূর এক শহরে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে কান্তা তাই ভাবে।

সুনীলের কোন অসুখ হয় নি।

না খেয়ে কাজের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে সে পথের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

জ্ঞান ফিরে এসেছিল অল্পক্ষণের মধ্যেই কিন্তু মাথা তুলে কোনদিকে তাকাবার ক্ষমতাটুকুও তার ছিল না। সেইখানে পথের ধারে মাথা গুঁজে অজ্ঞান মানুষের মতই সে পড়েছিল রাত দশটা পর্যন্ত।

বড় শহর বলেই তারপর তার ভাগ্যে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে হাসপাতালে চালান হবার সৌভাগ্য জুটেছিল।

সুনীলকে বিদায় দেবার জন্য হাসপাতালের লোকেরাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বেডের অভাবে খাঁটি রোগীদের ফিরিয়ে দিতে হয়—একটা নীরোগ সুস্থ ছেলেকে শুধু খাওয়াবার জন্য আটকে রাখলে চলবে কেন।

কান্তা জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি ফিরবে তো?

সুনীল বলে, হ্যাঁ, বাড়ি ফিরব। এভাবে ভবঘুরে হয়ে কিছু করা যায় না। দু'এক দিনের মধ্যে আমি নিজেই রওনা দিতাম।

: না খেয়ে, বিনা টিকিটে?

: তোমরা টাকা পাঠাবে বলেই অপেক্ষা করছিলাম। ডাক্তারকে সব জানিয়ে রোগী বলে হাসপাতালেই পড়েছিলাম। আমার লজ্জা ভয় হতাশা সব কেটে গেছে কান্তাদি —ফিরে গিয়ে কিছু আমি করবই করব।

: অন্যরকম পাগলামি?

সুনীল হেসে বলে, না, এবার যাই করি, দাদার সঙ্গে নয়তো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে করব।

সময় ছিল সঙ্গে টাকাও ছিল। সুনীলকে নিয়ে কান্তা সোজাসুজি কলকাতা ফেরার জন্য রওনা দেয় না, অনিলদের নিশ্চিন্ত করার জন্য একটা খবর পাঠিয়ে দিন দশেক এদিকে ওদিকে দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ায়।

জীবনে হয়তো আর সুযোগ হবে না।

বাড়ি ফেরার জন্য সুনীল ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, একরকম নিরুপায় হয়েই সে কান্তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

উনিশ

এইভাবে যখন চলতে থাকে তাদের জীবন নাটকের পালা, নানা জটিলতার ফাঁদে ঘুরপাক খেতে খেতে কেবলি বাধা-বিপত্তির দেয়াওলে কপাল ঠুকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় আশা-আনন্দের কল্পনা—সবার কাছে চিরদিন যে তুচ্ছ বাতিল হয়েছিল সেই রোগা বেঁটে তোতলা সমীরের জীবনে পর্যন্ত নাটক ঘনিয়ে আসে।

পরীক্ষা পাসের লেখাপড়া তার খতম হয়ে গেছে। তিনবারের চেষ্টায় স্কুলের সীমা কোনরকমে ডিঙিয়ে যাবার পর যথারীতি কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হলেও তাকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে বলা শুধু যে অর্থহীন নয়, অন্যায়—সে খবরটা উমা এবং হরিপ্রসন্ন দু'জনেই রাখত।

সে কি করছে না করছে সে বিষয়ে তারা কিছুই জানত না।

কারণ সুনির্দিষ্ট কিছুই সমীর করত না।

টুকটাক কাজ সে করছে, সংসারে টাকা দিতে না পারলেও নিজের খরচটা চালিয়ে যাচ্ছে - এটাই যথেষ্ট মনে করে তার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকার স্বস্তি পাওয়াটা সম্ভব হয়েছিল।

বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে উমা চাকরিটা আঁকড়ে থাকায় বাড়িতে কিছু কিছু মাছ দুধ আনা আর সপ্তাহে একদিন মাংস করার ব্যবস্থাটা বজায় ছিল। গোড়ায় সমীর সবই খেত, তারপর হঠাৎ ওসব খাওয়া একেবারে বর্জন করেছে। উমার সঙ্গে তার কথা বলার খবরটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্রী।

ফর্সা রঙ। কাগজের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে চায় এরকম সাদাটে রকম ফর্সা।

ঃ নিরামিষ খাবি বলে মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছিস সে আলাদা কথা, যদিও তোর পক্ষে এটা উচিত হয় নি—মাছ ডিম মাংসই তোর সব চেয়ে বেশি দরকার। ঝোঁক চেপেছে, নিরামিষ খা—কিন্তু একটু দুধ খাস না কেন সমীর?

ঃ আমাদের ওসব না খাইয়ে টাকা জমাও—ছেলেমেয়ে হলে তাদের খাওয়াবে।

ঃ বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তোর।

ঃ কবে সুশ্রী ছিল?

ঃ ছিল বৈকি। ছেলেবেলায় পাড়ার লোকে ডেকে তোকে আদর করত।

সমীরের চেহারা প্রকৃতির নিয়মেই বেঁটে এবং রোগা—বাইশ তেইশ বছরের জোয়ানকে মনে হয় ষোল সতের বছরের কিশোর। সেই চেহারাতেও বিশ্রী একটা শিঁটকে ভাব এসেছে নজরে পড়লে উমা এইভাবে খানিকটা উদ্বেগ প্রকাশ করে।

মনে মনে সঙ্কল্প করে, ডাক্তার দেখিয়ে মাছ দুধ খাইয়ে ভাই-এর শরীরটা ঠিক করতে হবে।

নিজের ঝনঝাটে কিছুই করা হয় না।

কে জানত অপুষ্ট অকেজো এই জোয়ানটার জন্য দরদ জাগবে সুমতির মনে।

শুধু নিরীহ নয়, নির্জীব।

নিজের মনে চুপচাপ থাকে—বাড়িতে সে যে আছে এটা একরকম টের পাওয়া যায় না।

পিঁড়ি বা আসন পেতে জলের গ্লাস গড়িয়ে দিয়ে থালায় ভাত বেড়ে এনে তাকে খেতে দিতে হয় না।

নিজেই গ্লাসে জল ভরে রেকাবির মত ছোট থালাটি নিয়ে রান্না ঘরের কোণে উবু হয়ে বসে।

শুধু শাক পাতা ডাল তরকারী দিয়ে ভাত খায়, তাও সামান্য পরিমাণে।

জলের গ্লাস আর থালাটা সে নিজেই ধুয়ে মেজে যথাস্থানে রেখে দেয়।

বাড়িতে যে ঝি নেই—চাকরি করে বলে উমার যে বাসন মাজার সময় নেই—এসব সর্বদা সে যেন কার্যকরীভাবে খেয়াল রাখে।

কেউ তাকিয়ে দেখে না, তারিফ করে না, তবু সে নিজের মনে নিজের ঝনঝাট নিজেই যথাসাধ্য সামলে চলে।

সুমিতিকে বলে, স্বপাক খেতাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, হাঙ্গামা অনেক। লাভও নেই—ভাত মাকে রাঁধতেই হবে, আমার জন্য দু'মুঠো বেশি রান্না করা!

তার কথা শুনে সুমিতি ব্যঙ্গের সুরে বলে, দু'মুঠো! এই বয়সে মোটে দু'মুঠো ভাত তুমি খাও?

সমীর কিছুমাত্র লজ্জা না পেয়ে হেসে বলে, যেটুকু হোক খাই তো, সেটাও ফোটাতে হয়।

সংসারে টাকা দাও?

পাঁচ দশ টাকা দিই। না দেওয়ার সামিল।

কাকে দাও?

মাকে।

এবার থেকে উমাদিকে দিও।

সমীর মাথা নাড়ে।

দশ পনেরটা টাকা দিতে গেলে দিদি হাসবে। সারা মাস ধরে মা'র যে টুকটাক খুচরো খরচ আছে, এটাও দিদির খেয়াল থাকে না—মা'কে একটা পয়সা দেয় না। দু'পয়সার কিছু কিনতে হবে, দিদির কাছে পয়সা চাও।

সুমিতি হেসে বলে, কথাটা সত্যি তো, না বানিয়ে বলছ? উমাদি তো ওরকম বেহিসাবী নয়!

ঃ বেহিসাবী নয়, বেশি হিসাবী।

উমা ওরকম বাড়াবাড়ি শুরু করে থাকলে সমীরের একটু রাগ হওয়া আশ্চর্য নয় কিন্তু তার কথায় এমন ঝাঁঝ প্রকাশ পায় যে সুমিতি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

পয়সা কড়ির ব্যাপারে উমা হিসাব করে চলে বলে এত গায়ের জ্বালা সমীরের!

সমীর বলে, দিদি জানে আমি ওর পয়সায় খাওয়া পরা চালাচ্ছি। সব যে নিজে

চালাই, সংসারে যা দিই তাতে যে আমার মত তিনজনের পেট চলে যায়, দাদ তা জানেও না।

ঃ জানিয়ে দিলেই হয়। বেচারী খেটেখুটে রোজগার করছে, সব দিকে কি নজর থাকে?

এসব যুক্তির দাম নেই সমীরের কাছে। জীবনের দামটাই বড়রকম আদর্শগত নিয়মনীতির হিসাবে সে করে থাকে।

পঙ্গু একজন যুবকের পক্ষে এটা সত্যই আশ্চর্য কথা।

ঃ সব দিকে নজর না রাখতে পারে, কোনদিকেই রাখবে না।

ঃ সংসারটা চালাচ্ছে তো?

ঃ সংসার অনেকেই চালায়। চাকরি করে মা-বাপ ভাই-বোনের সংসার চালানোর মধ্যে বাহাদুরী কিছু নেই। তাও যদি খাতিরের চাকরি না হত।

তারপর সমীর একটু হেসে বলে, আমি বরং খেটেখুটে রোজগার করি—সত্যি-কারের খাটুনি। দিদির তো আরামের চাকরি। পয়সার জন্য খাটার মানে দিদি জানেই না।

সুমিতির বয়স বেশি নয়, সংসারের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমীরের ভাবান্তর তলিয়ে বুঝবার সাধ্য তার ছিল না।

কিন্তু ভাবান্তর যে ঘটেছে ওই বয়সের ছেলেমানুষী বুদ্ধি দিয়েই সেটা সে ধরতে পারে।

ছেলেমানুষের মতই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে বসে, উমাদির ওপর তোমার আজকাল এমন বিরাগ জন্মালো কেন?

সমীর চুপ করে থাকে।

সুমিত আব্দারের সুরে বলে, বলই না মনের কথাটা—শুনি। আমায় বলতে দোষ নেই। আমি সেরকম ফাজিল মেয়ে নই যে তোমার মনের কথা শুনে গিয়ে দশজনকে শুনিয়ে বেড়াব।

তবু সমীর চুপ করে থাকে।

তার শীর্ণ শ্রান্ত কাগজের মত সাদাটে মুখের দিকে চেয়ে মমতা যেন উথলে ওঠে সুমিতির বুকে। চোখে প্রায় জল এসে পড়ার উপক্রম হয়। সে জোর দিয়ে বলে, বলো, তোমায় বলতেই হবে! এই সেদিন পর্যন্ত তুমি উমাদির রীতিমত ভক্ত ছিলে বলা যায় —এর মধ্যে কি ঘটল যে মনটা তোমার বিগড়ে গেল? আমাকে বলতে হবে!

সমীর বলে, বলছি।

বলে, সে রান্না ঘর থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে আনতে যায়। দেশলাই বাঁচানো নয়, দেশলাই তার সত্যই খতম হয়ে গিয়েছিল।

সমীরের নিজের ঘরে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সে থাকে হরিপ্রসন্নের কামরায়।

দুটো চৌকির স্থান কুলোবে না বলে দু'জনের জন্য মেঝেতেই বিছানা করার ব্যবস্থা—সকালে বিছানা তুলে নেবার পর প্যাকিং কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি হাল্কা ছোট

বার করে দিয়ে।

সুমতি ভাবে, এত বেলাতেও আজ এদের বিছানা তোলা হয় নি কেন কে জানে। সমীর নিজেই হয়তো বিছানা তোলে -টেবিল চেয়ার টুলটা ঘরে আনে। সে এসে তার এই দৈনন্দিন কাজে হয়তো ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

হরিপ্রসন্ন ভোরবেলা ছেলে পড়াতে বেরিয়ে যায়- এককালে নাম করা বিদ্বান মাস্টার ছিল, এখন দু'বাড়িতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাচ্চা-বাচ্চাদের প্রাথমিক পাঠ শেখায়।

সমীর ফিরে এসে সোজাসুজি বলে, দিদির ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

ঃ উমাদি'র ওপর ঘেন্না ধরে গেছে!

ঃ হ্যাঁ। কবে থেকে ঘেন্না ধরেছে জানো? চাকরির খাতিরে যেদিন বিয়েটা বাতিল করেছে।

সুমতি ভেবে চিন্তে বলে, ছেলেমানুষি করলেই তো হয় না। ভালবাসার ব্যাপার হলে অন্য কথা ছিল। চাকরি খুইয়ে বিয়ে করার কোন মানে হয় না।

তার কথা শুনে সমীরের ফর্সা সাদাটে মুখে ক্ষীণ একটু রক্তের ঝলক খেলে যায়।

ঃ ভালবাসার কথা বাদ দাও! বিয়ে করব কি করব না, সেটা আমার খুশি। এ স্বাধীনতা থাকবে না, এমন চাকরি মানুষ করে?

সুমতি বিজ্ঞের মত বলে, পরের চাকরি করতে হলে অনেক স্বাধীনতা বাদ দিতে হয়।

সমীর বলে, তা আমিও জানি। কিন্তু সেসব হল টুকিটাকি স্বাধীনতার ব্যাপার -- অফিসে নিয়ম-কানুন মানা ছাড়াও ওরকম অনেক কিছু মানতে হয়। কিন্তু একেবারে আসল স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ --

ঃ বিয়ে করা না করা বুঝি আসল স্বাধীনতা?

ঃ নিশ্চয়। বিয়ের সব ঠিকঠাক - কর্তা খুশিমত হুকুম দিলেন বিয়ে করা চলবে না —বাস, বিয়ে বাতিল হয়ে গেল! কেন, চাকরিটা বাতিল করতে পারত না দিদি?

এতক্ষণ বেশ ধীরে সুস্থে কথা বলছিল, দেখে টের পাবার উপায় ছিল না তার অন্য কোন তাগিদ আছে। হঠাৎ সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি নাইতে চলে যায়।

সুমতি রান্না ঘরে গিয়ে বসে।

সমীর আজকাল কি খায়, কতটুকু খায়, কিভাবে খায় নিজের চোখে দেখে তবে আজ সে বাড়ি ফিরবে।

দেরী করার জন্য বাড়ির সবাই যতই রাগ করুক আর বকুনি-ঝকুনি দিক কিছুই সে গ্রাহ্য করবে না।

উমাদের বাড়িতে সে যখন খুশি, যতবার খুশি যাক তাতে কারো আপত্তি নেই. একলা একলা যাওয়াটাও কেউ দোষের মনে করে না -একমাত্র মুকুল আর বিধবা ছোট পিসি গঙ্গা ছাড়া।

কিন্তু সে যেন সময় মত যায় এবং সময় মত ফিরে আসে। বাড়িতে কাজ-কর্ম আছে,

নানারকম ঝনঝাট আছে—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ির মত হলেও সেখানে যখন খুশি বেড়াতে গিয়ে যতক্ষণ খুশি আড্ডা মেরে এলে চলবে কেন।

একালের হিসাবেও বিয়ের বয়স ঘনিয়ে এসেছে। দায়-দায়িত্ব কাজ-কর্ম তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে।

সুমতি এসব নিয়ম এসব রীতি নির্বিবাদে মেনে চলে।

অনর্থক ঝগড়া করে লাভ কি? আপন হোক পর হোক তার প্রাণের যাতনা সে ছাড়া অন্য কেউ তো বুঝবে না।

আজ তার মাথা বিগড়ে গেছে।

সমীরের মুখ থেকে শোনা প্রেমের স্বাধীনতার ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য তার নেই। নিজের ভাবে বিভোর হয়ে সমীর অনেক বড় বড় কথা বলেছে—বড় বড় কথা বলাটা দাঁড়িয়ে গেছে নেশার মত অভ্যাসে—না বলে তারও উপায় নেই। নিজের মনের মত করে ঢেলে নিয়ে সেজে নিয়ে যেটুকু বুঝতে পারবে সেটুকু মেনে নেবার চেষ্টা করতে গেলেই গণ্ডগোলের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

সমীরকে সে কি ভালবাসে?

সুমতির তা জানা নেই।

ওর জন্য কেন তার এত চিন্তা-ভাবনা মায়া-মমতা জেগেছে তাও সুমতি জানে না।

রান্না নিয়ে ব্যতিব্যস্ত উমার মা'র সঙ্গে ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা ভাবে দু'চারটে কথা বলে, কি পরিমাণ তেল মশলা দিয়ে আলু কুমড়ার তরকারিটা রান্না করা হচ্ছে—সেটা ভালভাবে নজর করে দেখে।

মাছ ডিম সমীর খাবে না। এই তরকারিও সে খাবে কিনা কে জানে!

উমার মা ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা বলে। এক হাতে খুন্তি দিয়ে তরকারিটা নাড়ে, অন্য হাতে পাখা নেড়ে উনোনের আঁচ বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে যায়—মুখ ফিরিয়ে তাকাবার সময় বা উপায় তার নেই।

তার সব কথাই হয় ছোট ছোট আলগা জিজ্ঞাসা—সুমতি এবং তার বাড়ির মানুষদের সম্পর্কে।

সুমিষ্ট স্নেহ ভরা কণ্ঠস্বর—সুমতি যে নিজে থেকে বাড়ি বয়ে এসে তার রোগা তোতলা ছেলেটার প্রতি দরদ ভাব বজায় রেখেছে, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য রান্না ঘরে এসে বসেছে, এজন্য উমার মা'র আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার যেন অন্ত নেই।

তাকে নিয়ে কি আশা উমার মা'র মনে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যায় আজকাল সুমতি সেটা টের পেয়েছে।

প্রায় পঙ্গু ও অকর্মণ্য ছেলেটার জীবনের সঙ্গে যদি গেঁথে দেওয়া সম্ভব হয় এই মমতাময়ী মেয়েটির জীবন—উমার মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। একটি বৌ নিয়ে ঘর করবে নিজের সুখের হিসাবটাই শুধু তার নয়, ছেলেটাও তার মায়া-মমতা আদর-যত্ন পাবে। সে চোখ বুজলে সমীরের দিকে কে তাকাবে ভেবে বোধ হয় উমার মা'র রাতে ঘুম হয় না।

ওই ছেলের জন্য যেমন তেমন মেয়েও যে জুটবে না সেটা তো জানা কথাই, দরদের টানে সুমতি যদি রাজি হয় !

মনে মনে হাসি পাওয়ার বদলে সুমতির প্রাণটা জ্বালা করে।

সমীরের জন্য তার প্রাণের টান আছে শুধু এইটুকু জেনেই উমার মা এমন একটা অসম্ভব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এমন আশাও পোষণ করতে পারে !

তার না হয় আপত্তি হবে না।

সমীরের স্বাস্থ্য নেই, বিদ্যা নেই, কয়েকটা কথা স্বাভাবিক ভাবে একটানা উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই—রোজগার নেই।

অন্য দিকে কয়েকটা বিড়ি টানা ছাড়া কোন বিলাসিতা না থাকলেও এবং নিজে সাবান দিয়ে কেচে নিয়ে সস্তা জামা-কাপড়ে চালিয়ে দিলেও নিজের খরচ চালিয়ে সে যে কি ভাবে প্রতি মাসে সংসার খরচের জন্য তিন চার দফায় পনের বিশটা টাকা মা'র হাতে তুলে দেয় সেটা তো রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার।

চুরি-চামারি পকেট কাটার ব্যাপার চালিয়ে যাচ্ছে কি না তাই বা কে জানে !

সে না হয় দরদের খাতিরে এসব কিছুই গ্রাহ্য করবে না সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট সয়ে কাটাতে হবে জেনেও তোয়াক্কা রাখবে না-- সমীরের গলায় বরমাল্য দিতে রাজী হবে।

কিন্তু উমার মা কি ভুলে গেছে সে ভাই-বোন মাসী-পিসিদের মস্ত একটা সংসারের অল্পবয়সী একটি মেয়ে মাত্র ? কার হাতে তাকে সমর্পণ করা হবে সে বিষয়ে তার সম্মতি অসম্মতি আপত্তি নিরাপত্তির প্রশ্নই ওঠে না ?

আত্মীয়-স্বজনেরা যা স্থির করবে সেটাই হবে চরম কথা ?

সমীরের সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠলে সকলে হেসে উড়িয়ে দেবে ?

ভাববে একটা তামাসা করা হচ্ছে ?

সমীর স্নান সেরে তার সম্বল ধুতিটা এবং শার্টটি গায়ে চড়িয়ে চুল আঁচড়ে রান্না ঘরে খেতে আসবার আগেই সুমতি তার জন্য পিঁড়ি পেতে তার নিজস্ব কাঁচের গ্লাসে জল ভরে চীনা মাটির প্লেট ছোট বাটিটা ধুয়ে সব ঠিকঠাক করে রাখে।

সমীর এসেই একটু রাগত ভাবে বলে, এসব করতে গেলে কেন মা ? তোমায় না কতবার বলেছি আমার জন্য একটুও বাড়তি খাটুনি তুমি খাটতে পারবে না ? রেঁধে দিচ্ছ তাই ঢের।

বার বার ঠেকে গিয়ে থেমে থেমে জড়িয়ে জড়িয়ে কত চেষ্টায় কত কষ্টেই সে কথাগুলি উচ্চারণ করে।

ধৈর্য ধরে তার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে উমার মা বলে, আমি নই, সুমতি করেছে।

ঃ ও !

সুমতির দিকে চেয়ে সমীর একটু হাসে।

মাপা এক হাতা ডাল দিয়ে অল্প খানিকটা ভাত মেখে খেতে আরম্ভ করে খুব ধীরে

ধীরে সুমতিকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি করে জানলে খাওয়ার সময় এই তিনটে ছাড়া বাড়তি বাসন নিই না ?

খেয়াল করে সুমতি আশ্চর্য হয়ে যায় যে কথাগুলি বলতে গিয়ে সমীর একবারও ঠেকে যায় না, একটুও তোতলায় না।

বিস্ময় চেপে রেখে হেসে বলে, আহা, আমি যেন নতুন এলাম, তোমার বিষয়ে জানতে কিছু বাকী আছে। প্লেট গেলাস নিজে ধুয়ে রাখো তাও আমি জানি। আর একটু ডাল নেবে না, আর একটু আলু ভাতে ?

ঃ নাঃ। আমাকে মাপ মত খেতে হয়—ওজন ঠিক রেখে।

এবারও সে তোতলায় না।

উমার মা বলে, আমার কি মনে হয় জানিস বাছা ? ও ইচ্ছে করে তোতলিয়ে কথা কয়, ইচ্ছে করে কম খায়।

খানিকটা তরকারি দিয়ে বাকী ভাতটা মাখতে মাখতে সমীর বলে, তোমরা বুঝবে না। এটা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। হঠাৎ শরীরটা ভারি হাল্কা লাগে, কিছুক্ষণ তোতলামি বন্ধ থাকে। তারপর আবার আরম্ভ হয়। সব জেনেও কেন উল্টোপাল্টা কথা বলছ মা, আমার ধাত জানতে তোমার বাকী আছে ? মাপ মত না খেলে পেট ফাঁপবে জান না ?

ঃ জানি রে জানি, সব আমি জানি।

বাচ্চা বয়েস থেকে কত ডাক্তার দেখালাম, কত চিকিচ্ছে করালাম—কিছুতে কিছু হল না। আমারই কপালের লেখা।

সুমতিকে প্রায় চমকে দিয়ে সমীর সশব্দে হেসে ওঠে।

ঃ আর কেন মিছে মাথা ঘামাও, আপসোস কর ? কিছু হয় নি তো হয় নি—চুলোয় যাক। জগতে কত কানা খোঁড়া বোবা হাবা মানুষ আছে—ছোট মামা তো সাত বছর বয়স থেকে পক্ষাঘাতে বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাচ্ছে। সে তুলনায় আমি তো দিব্যি আছি—খাই দাই খাটি ঘুরে বেড়াই বিস্ময়ের সত্যিই সীমা-পরিসীমা থাকে না সুমতির।

মাঝে মাঝে তোতলামিটা কম মনে হয়েছে কিন্তু অবাধে তাকে এমন অনর্গল কথা বলে যেতে সে আর কখনো শোনে নি।

সমীরের খাওয়া শেষ হতে হতে উমা এসে যায়।

ব্যস্তভাবে বলে, যা রান্না হয়েছে আমায় দিয়ে দাও মা। যা পারি নাকে মুখে গুঁজে আমায় এখুনি বেরোতে হবে।

ঃ এত তাড়া কিসের উমাদি ? তোমার অফিস তো সাড়ে দশটায় ?

ঃ কয়েকদিন ন'টায় হাজিরা দিতে হবে।

সমীর জিজ্ঞাসা করে, ওভার টাইম পাবে তো ?

ঃ কি জানি। হয়তো পাব। একভাবে না পাই অন্যভাবে পাব।

সমীর একটু হাসে।

উমার মা বলে, মাছের ঝোলটা যে হয়নি ? মাছ ছাড়া তোর মুখে তো আবার ভাত রোচে না। একটু দেরী কর না, ঝোলটা করে দিই ?

উমা রেগে বলে, কোন সকালে মাছ এসেছে, এখনো ঝোল হয়নি ? তোমরাই ডোবাবে আমাকে।

ঃ আজ তাড়া আছে আগে তো বলিস নি। ডাল তরকারি দিয়ে একটু ধীরে সুস্থে খা—ইলিশ মাছের ঝোল করতে কতক্ষণ।

সুমতি যেন খুশিতে ফেটে পড়ে বলে, ইলিশ মাছ ! ঝোল ভাত না খেয়ে নড়ব না মাসীমা - তোমাদের কম পড়লে পড়বে।

প্রায় আদেশের সুরে সমীরকে বলে, উঠো না, গরম গরম মাছের ঝোল দিয়ে আর এক হাতা ভাত খেয়ে যাও। না খেলে কিন্তু ঝগড়াঝাটি ফাটাফাটি হয়ে যাবে—আর কোনদিন আসব না।

ঃ আমি তো মাছ খাই না।

ঃ আজ খেতে হবে।

ঃ অম্বল হলে কে সামলাবে ?

ঃ আমি সামলাব।

সকলকে অবাক করে দিয়ে সমীর সত্য সত্যই মাছের ঝোল হবার প্রতীক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকে এবং ঝোল রান্না হলে বেশ খুশির সঙ্গেই বাড়তি মাছ ভাত পেটে চালান দেয়।

সুমতি বলে, প্লেট গেলাস আমি ধুয়ে রাখব'খন।

সমীর খাওয়া শেষ করে কথা না বলে আঁচাতে যায়।

উমা বলে, কী মন্ত্রে ওকে তুই বশ করেছিস রে ?

সুমতি বলে, যে মন্ত্রে তেজী গোঁয়ারকে বশ করতে হয়।

পাঁচীর একটি ছেলে হয়েছিল বছরখানেক আগে।

রোগা ক্যাটা ছেলে।

হাড় যেন শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা।

জীবন্ত কঙ্কালের মত ছেলেটার মা হবার পর থেকেই পাঁচীর কিন্তু অদ্ভুত আশ্চর্য রকম পরিবর্তন ঘটেছে।

শাশুড়ী ননদের নির্যাতনে আর কার্তিকের অবহেলায় প্রাণের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছিল—এখন ওরকম নরম হয়ে থাকার বদলে তার যেন হয়েছে উল্টো ধাত, গরম ধাত।

একলা কার্তিকের রোজগারে সংসার চালানো সত্যই অসম্ভব। তার নিজেরই এমন খাওয়া জোটে না যে খিদে মিটে বুকে একটু দুধও আসবে—বাচ্চাটা শুষে নিয়ে বাঁচবে।

শিশু কি মায়ের শুকনো বুকের চামড়া চেটে মোটাসোটা হয়, না বেঁচে থাকতে পারে।

পাঁচী তাই শাশুড়ী ননদদের ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে ওদের উপর বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার দায় চাপিয়ে তিন বাড়িতে কাজ জোগাড় করে নিয়েছে।

বাচ্চাটাকে বুকে আঁকড়ে রেখে ঘরে বসে থেকে লাভ নেই।

শুকনো চামড়া হয়ে গেছে বুক।

সারাদিন কেঁদে ককিয়ে চেষ্টা করলেও একফোঁটা পুষ্টি বেচারার জুটবে না।

তার চেয়ে পয়সা দিয়ে কিনে আনা সস্তা দামের তৈরী খাদ্য চামচ চামচ খাক—হাড় চামড়া সার হয়ে দাঁড়ালেও প্রাণটা হয়তো টিকে যাবে।

সকাল সন্ধ্যায় তিন বাড়িতে কাজ করে।

দু'বাড়িতে সকাল বিকাল বাসন মাজা ঘর নিকানো উনান সাজানো ঝি-গিরির কাজ—এসব সেরে সন্ধ্যা নাগাদ আর এক বাড়িতে গিয়ে রাত্রিবেলার রান্না করার কাজ।

রাত্রের খাওয়াটা ও বাড়িতেই সে পায়।

কিন্তু সকলকে খাইয়ে তবে তার ছুটি মিলত নিজের পেট ভরাবার—নিষ্কৃতি পাবার।

সেটা তো সম্ভব নয়।

কয়েকদিন কাজ করেই সে তাই গিন্নী-মাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে এ-কাজ তার পোষাবে না।

তবে ছোটলোকামিও সে করবে না। অন্য লোক যোগাড় করতে যে-কদিন তাদের সময় লাগবে সে-কদিন চোখ কান বুজে এইভাবেই সে খেটে যাবে—নিজের কথা ভাববে না।

মরিয়া হয়ে কঙ্কালসার বাচ্চাটাকে সেদিন পাঁচী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

আড় চোখে বাচ্চাটার দিকে তাকাতে তাকাতে দোক্তা-ভরা চার পাঁচটা পান একবারে মুখে পুরে দিয়ে গিন্নী-মা ব্যবস্থা দিয়েছিল যে কাজ ছেড়ে দেবার দরকার নেই, রান্নাবান্না শেষ করেই সে ঘরে ফিরে যেতে পারবে।

এখানে খেয়েও সে ঘরে ফিরতে পারে, খাবারটা নিয়েও যেতে পারে।

তবে তাকে অথবা এ বাড়ির অন্য কোন একজনকে দেখিয়ে যেন নিয়ে যায়।

ঃ আমি কি চোর যে বেশি বেশি নিয়ে যাব ?

ঃ কে চোর কে সাধু এত সহজেই কি জানা যায় বাছা ? সংসারের এই হল নিয়ম। বাড়িতে গিয়ে খাবে বলে কি নিচ্ছ কতটা নিচ্ছ দেখিয়ে নিয়ে যাবে—তাতে তো দোষের কিছু নেই। তোমারও মুখ রক্ষা হবে। মাছে টান পড়লে কেউ বলতে পারবে না সাড়ে তিন টাকা সেরের মাছ এক টুকরো বলে তুমি পাঁচ টুকরো নিয়ে গেছ।

ঃ ঠিক কথা বলেছেন মা।

খুব ভোরে এসে অনিলদের বাড়িতে শুধু বাসনটা মেজে দিয়ে যায়।

মুকুল থেকে শুরু করে মাসী-পিসিরা সকলেই সকাল বেলা নানা রকম আচার-নিয়ম পালন করে।

এত বড় সংসারের এক কাড় এঁটো বাসন মাজতে গেলে ওসব বাদ দিতে হয়।

বুড়ি রাণুর মা বাসন মেজে দিয়ে যেত। হঠাৎ সে মরে যাওয়ায় বাড়ির সকলেই অবশ্য চালিয়ে নিয়েছে কিন্তু গণ্ডগোলের সীমা থাকেনি।

বাসন মাজার জন্য তারপর রাখা হয়েছে পাঁচীকে।

মুকুলেরা ভোর রাত্রে ওঠে।

কিন্তু পাঁচী এসে কড়া নাড়লে প্রায় রোজই সদর দরজার খিল খুলে দেয় সুমতি।

পাঁচী হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে, রাতে বুঝি ঘুম হয় না দিদিমণি?

সুমতিও হাসি মুখে জবাব দেয়, রাত ভোর ঘুমিয়েছি, আর কত ঘুমোব বল?

পাঁচী হাল্কা সুরটা বজায় রেখেই বলে, এই বয়সে যত পারবে খেয়ে নেবে, ঘুমিয়ে নেবে। মেয়েমানুষের ব্যাপার তো, ঝন্‌ঝাট যখন শুরু হবে, কখন খাবে কখন ঘুমোবে ঠিক রইবে নি কো।

পাঁচী 'মেয়েমানুষের কপাল' বা 'অদেষ্ট' বলে না—বলে 'ব্যাপার'।

সুমতি অবশ্য সেটা খেয়াল করে না।

তার মগজে অত বুদ্ধি গজায় নি।

সে অন্যভাবে অন্য ভাষায় জবাব দেয়, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি ওসব মানতে হবে? আমি মানবো না। দেখি তো কার সাধ্যি আছে আমাকে মানায়।

ঃ অন্যে দেবে তবে তো অন্ন জুটবে দিদিমণি?

ঃ অন্ন না জুটলে উপোস দেব।

ঃ উপোস দিয়ে মানুষ বাঁচে?

ঃ না বাঁচতে পারি মরে যাব।

তাদের এই ধরনের কথাবার্তা সকলেরই কানে যায়—যারা অবশ্য ভোর রাত্রে ওঠে। মুকুল সুমতিকে তিরস্কার করে বলে, ঝিয়ের সঙ্গে তোর অত কথা বলার দরকার কিরে মতি?

সুমতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, তোমাদের সঙ্গে কথা বলে সুখ হয় না তাই। হলই বা বাসন-মাজা ঝি—কি সুন্দর খাঁটি খাঁটি কথা বলে।

ঃ মাথা তোর বিগড়ে গেছে মতি।

ঃ চিকিৎসা করে সারিয়ে দাও।

ঃ চিকিচ্ছে তোর করতেই হবে। আচ্ছা করে চাবকে দিতে হবে তোকে।

ঃ আনো না চাবুক? চেষ্টা করো না দিদিগিরি ফলাবার? মজা টের পেয়ে যাবে।

ঃ তুই তো বড় ঠ্যাটা হয়ে উঠেছিস!

ঃ আমি হই নি—তোমরা করেছ।

সকলে চিন্তিত হয়ে ওঠে।

মাথা কি সত্যই বিগড়ে গেল মেয়েটার? নইলে এমন মন-মেজাজ চাল-চলন তার

কি করে হয়? বদরাগী তেজী মেয়ে সত্যই, কিন্তু এরকম বিশ্রীভাবে সে তো কোনদিন রাগও প্রকাশ করে নি, তেজও দেখায় নি।

রাগ হলে বরং গুম্ হয়ে একেবারে চুপ হয়ে যেত—দু'এক বেলা খাওয়া বন্ধ রাখত।

মেয়ে যে সে বিষম রকম জেদী সেটা টের পাওয়া যেত কোন বিষয়ে কারো কোন কথা কানে তুলতে অস্বীকার করে মুখ বুজে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতায়।

যেন কালা বোবা মেয়ে, কারো কথা শুনবে না জবাবও দেবে না—মিষ্টি কথা হোক, দরকারী কথা হোক আর ধমক ধামক গালাগালিই হোক।

আজকাল সকলের মুখের ওপর কটাং কটাং কথা বলে—গা জ্বালানো ভঙ্গিতে বলে। সে যেন হঠাৎ পণ করেছে যে গুরুজন বা অভিভাবকদের উপদেশ বা তিরস্কার সহ্যও করবে না, গ্রাহ্যও করবে না, ঘোষ বাজারের মেছুনির মত ভাল মন্দ সব কথাতে ফোঁস করে উঠবে।

অনিল মিষ্টি সুরেই জিজ্ঞাসা করে, তোর হল কি রে সুমি?

সুমতি মুখ বাঁকিয়ে বলে, আবার কি?

ঃ সবার সাথে ঝগড়া শুরু করেছিস।

ঃ শোনা কথা—মিছে কথা বলছ। গায়ে পড়ে কার সাথে ঝগড়া করেছি? আমার পেছনে না লাগলেই হয়।

ঃ তুই যা খুশি করবি, আবোল তাবোল বকবি—কেউ কিছু বলবে না তোকে?

ঃ যার বলবার অধিকার আছে সে বলবে। সবাই মিলে উঠতে বসতে বলতে শুরু করলে মাথা বিগড়ে যাবে না?

অনিল আরও বেশি শান্ত ভাবে আরও বেশি মিষ্টি সুরে বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। আমি যা জিগ্যেস করছি সে কথার জবাব দে। এতদিন মুখ বুজে থাকতিস, কি এমন ব্যাপার ঘটল যে হঠাৎ কুঁদুলী হয়ে উঠলি? এটাই আমি বুঝতে চাইছি।

সুমতি বলে, বড় হইনি? আমার সাধ-আহ্লাদ নেই?

এইভাবে সুমতি আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। কি বলবে তাই যে তার জানা নেই।

সমীরের সম্পর্কে নিজের মন সে ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু নিজের মন ঠিক করে ফেলেছে বলেই অন্য সমস্ত প্রশ্ন আর সমস্যার তো মীমাংসা হয়ে যায় নি।

কয়েকদিন পরে উমার কাছে অনিল সুমতির খাপছাড়া ভাবে বিগড়ে যাবার কারণ কি তার হদিস পায়।

উমা বড়ই বিব্রত ভাবে বলে, কথাগুলি আমিই বলছি—প্রস্তাবটা কিন্তু আমার নয়। মা নিজেই আসছিল, আমি ভেবে-চিন্তে মা'কে ঠেকিয়ে বলতে এলাম।

অনিল বলে, ব্যাপারটা কি?

উমা বলে, সুমির সঙ্গে সমীরের বিয়ে দেবার জন্য মা পাগল হয়ে উঠেছে।

অনিল বলে, ও, এইজন্য সুমির পাগলামি শুরু হয়েছে।

অনিলকে বিশেষ বিচলিত হতে না দেখে উমা সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

উমা বলে, আমি ভেবেছিলাম কথাটা শুনে তুমি হেসে ফেলবে। সমীরের বিয়ে হবে, তাও আবার সুমতির সঙ্গে। মা নিজেই আসত। আমি ভাবলাম যে অপমানিত হয়ে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দেবে কি না কে জানে। তার চেয়ে আমিই তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাই।

অনিল দ্বিধা করে না।

পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় বলে, সুমতি যদি রাজী থাকে আমার কোন আপত্তি নেই।

ঃ সমীরের কি বিয়ে করা উচিত?

ঃ সেটা সমীর বুঝবে।

সমীর বুঝবে কি রকম? ওর কি মাথা ঠিক আছে? আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার আরম্ভ করেছে তুমি ধারণা করতে পারবে না। ওই তো টিং টিং করছে শরীর, তার ওপর চাকরি-বাকরি করে না, রেগুলার কোন ইনকাম নেই। বিয়ে করলে নিজেও মুশকিলে পড়বে, আমাদেরও ঝনঝাট বাড়াবে। এমনিই সামলাতে পারছি না, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি—মাসের শেষে যে কি অবস্থা হয়। তোমার বোনের দায়টাও ঘাড়ে চাপাতে চাইছ?

ঃ তোমার ঘাড়ে দায় চাপাব কেন? দায় হবে সমীরের। সমীর রোজগার করে—সারাদিন বসে বসে বিড়ি পাকায়।

উমা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

ঃ বিড়ি পাকায়?

ঃ দোকানটা অন্য পাড়ায়—বোধ হয় ইচ্ছে করেই দূরের দোকান বেছে নিয়েছে—জানাজানি হলে তোমরা লজ্জা পাবে।

উমা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, আমরাও তাই ভাবছিলাম—নিজের খরচটা কি করে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিড়ি পাকিয়ে কতই আর রোজগার হয়? বিয়ে করে চালাতে পারবে?

অনিল বলে, ওদের দু'জনকেই সেটা খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কোনরকম অন্যায় আব্দার চলবে না। বিয়ের সাধ জেগে থাকলে বিয়ে আমরা দিয়ে দেব, কিন্তু চালাতে হবে নিজেদের। না পারলে খোলার ঘরে গিয়ে থাকতে হবে।

উমা একটু কঠোর সুরেই বলে, যেভাবে হোক বোনটাকে পার করে নিশ্চিন্ত হতে চাইছ বুঝি?

অনিল রাগ করে না।

বলে, আমার দিকের হিসাব করছি না। ইচ্ছা অনিচ্ছাটা বোনের। চোখের সামনে দেখে আসছি তো সব ব্যাপার। সুমিকে কাঁদিয়ে ওর অনিচ্ছায় চাকুরে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব, দু'দিন বাদে ছাঁটাই হয়ে বেকার হবে। বিড়ি বানাক আর যাই করুক সমীর তো রোজগার করছে।

একটু থেমে যোগ দেয়, তাছাড়া সমীরের তেজ আছে। নইলে আমি রাজী হতাম না।

খবর শুনে পাঁচী খুশি হয়

অনিলকে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে দ্যান। মেয়ে যাকে মায়া করে তার সঙ্গে লটকে দেওয়াই ভাল।

পাঁচীর শুধু বাসন মাজার কাজ।

সুমতি মশলা বাটছিল।

হাত থেকে নোড়া কেড়ে নিয়ে তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে মুকুলদের উদ্দেশ্য করে বলে, ক'দিন বাদে বিয়ে, মেয়েটাকে দিয়ে মশলা বাটিয়ে নিচ্ছ? কেমন মানুষ গো তোমরা?